জা মা ল পু র জে লা

ঘরগুলো গ্রামের বিপদ হয়ে দাঁড়াল

মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পাকিস্তানি আর্মি ঢাকায় ক্রাকডাউন করে। এরপর তারা সারা দেশ দখলাভিজানে নামে। তাদের প্রতিরোধ করার জন্য যুবক তরুণ বয়সী ছেলেরা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পাকিস্তান আর্মি কয়েক দিনের মধ্যেই কামালপুর ও বকশীগঞ্জে ক্যাম্প স্থাপন করে। তাদের সহযোগীরা গরু, খাসি, মুরগি ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামে যাওয়া শুরু করল। আমাদের বাড়ির কাছে কিছু সংখ্যক হিন্দু পরিবার ছিল। বিপদ আঁচ করতে পেরে তারা সবাই ভারতে পালিয়ে চলে গিয়েছিল। কোনো লোক বাড়িতে ছিল না, শুধু খালি ঘরগুলো দাঁড়িয়ে ছিল।

ঘরগুলোই গ্রামের বিপদ হয়ে দাঁড়াল। পাকসেনা ও তাদের সহযোগীদের মূললক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল হিন্দুর সম্পদ লুট করা ও বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া। কেউ বাঁধা দিলে তাকেও খতম করা।

এক পর্যায়ে আমাদের বাড়িকে তারা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করল। দু-দুবার আমাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ঘন বসতির গ্রাম, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগির অভাব ছিলো না। ক্যাম্পের খুব কাছেই ছিল আমাদের এই গ্রামটি। কয়েকজন আলবদরসহ ৪-৫ জন পাকিস্তানি মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়িতে এসে গরু, ছাগল, মুরগি চেয়ে বসত। আর কি করা, জোগাড় করে সেগুলো ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে হতো। যখন বকশীগঞ্জ ও কামালপুর যুদ্ধ হয় তখন গ্রামের মানুষের কাছে নির্দেশ আসে যে, বাঁশ দিয়ে তৈরি ১-১.৫ ফুট লম্বা চুক্কা কাঠি প্রস্তুত করে যুদ্ধের কাজে সরবরাহ করতে হবে। আমাদের গ্রামটি বাঁশের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল তাই এ নির্দেশে বাধ্য হয়ে গ্রামের মানুষ চুক্কা প্রস্তুত করত আর মিলিটারিদের দিত। জানা যায় যে, আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রমিক সেজে এই চুক্কা মাটিতে পুঁতে দিত আবার রাতে এসে সেগুলো তুলে নিয়ে যেত।

এইভাবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা শুধু অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেনি। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে কৌশলগতভাবেও যুদ্ধ করেছে। আমাদের গ্রামে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। একদিন আমার এক মুক্তিযোদ্ধা চাচার খোঁজে পাক আর্মি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তখন সবাই ভয়ে কাঁপতে শুরু করি। কারণ চাচাকে আমরাই লুকিয়ে রেখেছিলাম।

সূত্র: জ-২১৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
আমিনা খাতুন	**লিয়াকত আলী**
বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : বাবা
৮ম শ্রেণি, রোল : ২১	

জ্ঞান হারিয়ে ফেলি

আমার তখন বয়স ১৫ বছর। ভারতের তোরা প্রদেশে গিয়ে ১৭ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভর্তি হই এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে ১১ নং সেক্টরে যোগদান করি। পাকবাহিনীর সাথে অনেকগুলো সম্মুখযুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। ৯ ডিসেম্বর আনুমানিক ভোর পাঁচটায় জামালপুর জেলার বেলটিয়া মহাসড়কে পাকবাহিনীর মর্টার শেলের আঘাতে আমার ডান পায়ের হাঁটুর নিচে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখি আমি মেঘালয় হাসপাতালে। পরে এক সহযোদ্ধার কাছ থেকে জানতে পারি আমার কমান্ডার জহিরুল হক মুন্সি নিজ কাঁধে বহন করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এজন্য আজও আমি স্বাধীন বাংলায় বেঁচে আছি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এই স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে আমার আকুল আবেদন, আসুন আমরা সবাই এই দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব পালন করি।

সূত্র: জ-২২২

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
রিনা পারভীন	**মো. সেলিম রেজা**
বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স : ৪৯
৮ম শ্রেণি, রোল : ০১	

দেশে নাকি যুদ্ধ হবে

আমার বয়স তখন পঁচিশ। বাবা-মায়ের ছোট ছেলে আমি। আমরা দুই ভাই এক বোন। বাবা-মা ভাইবোন মিলে ভালোই চলছিল। একদিন শুনলাম দেশে নাকি যুদ্ধ হবে। সবাই ভয় পেলাম। আমাদের পাড়ায় যত লোক ছিল সবাই তাদের টাকা-পয়সা মাটির তলে লুকিয়ে রাখল। কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামে পাকবাহিনী ও আলবদর এলো বড় বড় গাড়ি নিয়ে। মানুষের ওপর তারা নানা রকম অত্যাচার শুরু করল। অনেক মানুষ গ্রাম থেকে পালিয়ে গেল। আমরাও পালিয়ে থাকলাম। অনেক মানুষকে ওরা গুলি করে মারলো।

একদিন সন্ধ্যেবেলা কিছু মানুষ ধরে এনে পাক হানাদাররা গ্রামের একটি খালি জায়গায় নিয়ে গুলি করে মারল। আমরা পালাতে গিয়ে দেখি যাদের মারল তাদের মধ্যে এক লোক ভারতের। ওই লোক আর তার ছেলে এসেছিল বাংলাদেশে ব্যবসা করার জন্যে। অনেক টাকার মালিক ছিল ওরা। যুদ্ধের জন্য তারা ফিরে যেতে পারেনি। ওরা ছিল হিন্দু। আলবদররা খবর পেয়ে ওদের ধরতে যায়। বাবাকে ধরে কিন্তু ছেলেটা পালিয়ে যায়। ছেলেটাকে খোঁজার জন্য ওরা লোক পাঠায়। ওই জায়গা থেকে অনেক দূরে গিয়ে ছেলেটা নাকি এক পুকুরে সাত দিন নাক বের করে ডুবে ছিল। পরে ক্ষুধার জন্য পানি থেকে উঠে আসে। পালিয়ে পালিয়ে ছেলেটা আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। আমরা ওকে খাওয়াই এবং ফিরে যেতে সাহায্য করি।

সূত্র: জ-২২৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
ইসরাত জাহান সুমি	**মুহাম্মদ ইদ্রিস আলী**
বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	
৯ম শ্রেণি, রোল : ১১	

চোখ খুইলা দেখি মরি নাই

১৯৭১ সালে আমাদের গ্রামের লোক জানতে পারল যে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সকলেই ভাবলো আগেও অনেক এমন ঘটনা ঘটছে, যা শহরে শুরু হয়েছে আর শহরেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এ যুদ্ধ যে অন্য সব ঘটনার চেয়ে আলাদা ছিল, তা আমরা গ্রামের মানুষ বুঝতে পারিনি। আস্তে আস্তে যুদ্ধ বেড়ে গেল এবং আমাদের পাশের শহরে যুদ্ধ লেগে গেল। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে যুদ্ধ বুঝি আমাদের গাঁয়েও এলো।

তখন গ্রামের সকল মানুষ যুদ্ধের ভয়ে অস্থির। যুদ্ধ যে কেমন তা তারা জানে না। কিছু লোক আমাদের গ্রামের মানুষদের নিয়ে এক মিটিং করল এবং যুদ্ধ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলল। কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের মাদ্রাসা ফিল্ডে মিলিটারি বা পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্যাম্প করল। গ্রামের লোকদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার শুরু করল। পাকিস্তানিরা মানুষের গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি সব কিছু লুট করে

নিয়ে যেত তাদের আস্তানায়। কোনো বাড়িতে ছেলে থাকলে বাবা-মা সকলের সামনেই মেরে ফেলে যেত। যুবতী মেয়ে থাকলে তারে ধরে নিয়ে যেত। এরকম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা গ্রাম ছেড়ে নাজের হাজীর চরে গেলাম।

চার-পাঁচ দিন যেতে না যেতে সেখানেও হামলা করল তারা। অবশেষে আমি আমার তিন বাচ্চাকে নিয়ে আমার বাপেরবাড়ি চলে গেলাম। বাপেরবাড়ি যেয়ে দেখি সেখানেও গোলাগুলি। বাবারবাড়ির পাশের বাড়িগুলো পাকিস্তানিরা আগুন দিয়া জ্বালাইয়া ছাই করে দিছে। আমার বাপ আমারে দেইখা ভয় পাইয়া গ্রাম ছেড়ে বিলের কাছে নিয়া গেল। সেখানে গিয়া কইল যে, পাকিস্তানি শত্রুরা পানি দেখে ভয় পায়। তাই আমার বাপের নৌকা জোড়া লাগাইয়া বাঁশ দিয়ে মাঁচা বানাইয়া সেইখানে আমাদের থাকার জায়গা কইরা দিল। আমরা সকলেই বিলের মাঝখানে থাকা শুরু করলাম। কিছুদিন পর আমি আমার ছোট মেয়েটারে কোলে নিয়া আমার শ্বশুরবাড়ি যেতে লাগলাম। পথে দেখলাম নানা দৃশ্য। সকলেই দুর্দশায় পড়ছে। আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়া পৌঁছলাম। দেখি, সব বাড়ি পুইড়া দিছে। হাতেগোনা কয়েকটা বাড়ি পোড়ানো বাকি আছে। অনেকে মাটি কাইটা গর্ত করে সেইখানে থাকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমি এইসব দেখতেই গুলির শব্দ শুনতে পাইলাম আর তাড়াতাড়ি সে জায়গা ছাড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। বৃষ্টির মতো গুলি করা শুরু করল তারা। আমি তাড়াতাড়ি একটা পগারের মধ্যে ঝাঁপ দিলাম। আমার মেয়েটা কান্দন শুরু করল। খুব কষ্ট করে ওর কান্দন থামাইলাম। কারণ কান্দনের শব্দ শুনতে পাইলে ওরা আমাদের দুইজনরেই মাইরা ফেলাইতো। গুলি করা চলছে তো চলছেই। থামাথামি নাই। হঠাৎ একটা গুলি আমার ওপর দিয়ে গেল। আমি মনে করলাম, এই বুঝি আমরা মইরা গেলাম। কিন্তু না আমরা মরলাম না। বাঁইচা রইলাম, গুলিটা যখন যায় তখন আমি চোখ বন্ধ কইরা ছিলাম। চোখ খুইলা দেখি মরি নাই। কিছুক্ষণ পর গুলি বন্ধ হইল। আমি মাইয়াটারে শক্ত কইরা কোলে ধইরা গর্ত থেকে উঠে দিলাম একটা দৌড়। দৌড়ে বাড়ি গিয়া পৌঁছিলাম। আমার এ অবস্থা দেইখা আমার বাপে চমকিয়া উঠল। তারপর থেকে তারা আর আমারে শ্বশুরবাড়ি যাইতে দেয় না। আমি ওইখান থেকে আসার পর প্রথমে যাইবার চাই নাই। পরে আবার সেখানে যাওয়ার জন্য মনটা উতলা হইয়া গেল। অস্থির হইয়া পড়লাম। কিন্তু আমার বাপে আমারে যাইতে দিল না।

একদিন মাঝ রাইতে বিলের মধ্যে একটা বড় নৌকা আইসা দাঁড়াইল। আমরা সকলে মনে করলাম পাকিস্তানিরা আইছে। সকলে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলাম। আমি আমার তিন ছেলে-মেয়েকে নিয়ে এক কোণে থাকলাম। আমার বাপে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সেই নৌকার কাছে গেল। কাছে গিয়ে দেখল যে, সে নৌকায় আমার চাচাশ্বশুর ও অন্য কয়েকজন মানুষ। আমার বাপে তাদের দেখে মনে সাহস পায়। তাদের সকলেরেই বাঁচায়, ভাইকে আনে এবং কথাবার্তা কয় যুদ্ধ সম্পর্কে। চাচাজান গ্রামের অবস্থা জানান এবং বলেন যে, তার ছোট ভাই লুৎফর রহমান যুদ্ধে গেছে এবং তার জেঠাত ভাইও যুদ্ধে গেছে। তারা যুদ্ধে যাওয়াতে পাকিস্তানিরা রাইগা গেছে এবং গ্রামে অনেক খারাপ কাজ করতেছে। মেয়েদের ধরে নিয়ে যাইতেছে। ছোট শিশু মারছে গুলি করে। কাউকে ছেড়ে দিচ্ছে না। এসব কথা শুনে আমার বাজান আমারে আর ঘর থেকে বাইরে যাইতে দিল না।

আমি একদিন কাউকে কিছু না কইয়ে আমার শ্বশুরবাড়ি গেলাম। সেখানে দেখলাম আগে যাদের ঘর ছিল তাদের ঘর একটাও আর নাই। আর এখন এইখানে থাকে রাজাকার, আলবদরসহ আরও অনেক লোক। যারা বাংলাদেশের হইয়াও পাকিস্তানিদের সাহায্য করে। এসব আমার খুব রাগ ও ভয় হইল এবং আমি ওখান থেকে চলে এলাম। আর সেখানে যাওয়ার কথা ভাবলাম না।

এভাবে অনেক সময় কাইটা গেল। অবশেষে একদিন শুনলাম দেশ স্বাধীন হইছে। আর সেই দেশটি হইলো আমাদের দেশ। আমরা সবাই আমাদের গ্রামে আসলাম এবং রাজাকার ভাগাইলাম। এরপর থেকে শুরু হল বাংলাদেশের সুখের জীবন। বাংলাদেশে সকলেই স্বাধীনভাবে বাঁচার সুযোগ পাইল।

সংগ্রহকারী :
কামরুন্নাহার
বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৯ম শ্রেণি

বর্ণনাকারী :
মালেকা বেগম
বয়স : ৫৮ বছর

লাশ আসে জামালপুর থেকে

যুদ্ধের সময় আমার বয়স ১২ বছর। বাড়ি বকশীগঞ্জ বাজার, থানা দেওয়ানগঞ্জ,ময়মনসিংহ। মুক্তিযুদ্ধে সত্যিকার অর্থে আমি যা দেখেছি তার ওপর ভিত্তি করেই বলছি। প্রথম যে দিন আমাদের বকশীগঞ্জে পাক হানাদার বাহিনী হামলা করে তখন আনুমানিক বেলা ১২টা, বুধবার মার্চ মাস, তারিখ মনে নেই। তখন আমরা সবাই মিলে খাওয়া-দাওয়া করছি। এমন সময় গুলির শব্দ শুনতে পাই। বাজারে আমাদের কাপড়ের দোকান ছিল। কাকা তারাপদ সরকার এসে বললেন, পাকবাহিনী এসে পড়েছে, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। তখন যে যে অবস্থায় ছিলাম সেভাবেই বাড়ি থেকে বের হলাম। পার্শ্ববর্তী বাড়ি পার হয়ে আমরা আকন্দ বাড়িতে আশ্রয় নিই। কিছুক্ষণ পরে আমার বাবা নারায়ণ সরকার আমাদেরকে জানান পাকবাহিনী আসে নাই, এসেছে মুক্তিফোর্স। আমরা সবাই আবার বাসায় ফিরে আসি এবং ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সীমান্তের উদ্দেশে রওনা হই। তখন আমাদেরকে ভারতে যেতে সাহায্য করেন হামিদ চাচা ও তার সহপাঠী। তারা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন।

অনেক আগেই আমরা ভারতে যেতে পারতাম; কিন্তু তৎকালীন বকশীগঞ্জ সদর চেয়ারম্যান ও মুসলিম লীগের কিছু লোক আমাদেরকে যেতে দিত না। তারা ২৪ ঘণ্টা পাহারায় রাখত। সন্ধ্যায় যখন ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জে পৌঁছলাম, দেখলাম এক করুণ দৃশ্য। খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার অনাহারী লোক অসহায় অবস্থায় বসে আছে। আমরাও তাদের দলে শামিল হলাম। ক্ষুধায় কাতর সবাই, কী খাবে কিছুই নেই। এমন সময় আমার বাবার এক বন্ধু আ. হক এসে বলল নারায়ণদা, ছেলে-মেয়েরা খাইছে? বাবা বলল কিছুই আনতে পারি নাই, কী খাবে? তখন সেই লোক বলল, এখান থেকে অন্য কোথাও যাবেন না। আমি দুই ঘণ্টার মধ্যে খাবার নিয়ে আসব। ঘণ্টা খানেক পরেই ২ টিন মুড়ির ৫ মুচি গুড়, কিছু চাল ও আটাসহ তিনি হাজির হলেন একজন কামলা নিয়ে। তারপর খাবারগুলো বের করে দিলেন। আমরা সবাই খাওয়া-দাওয়া করলাম এবং ক্ষুধার্তদের আমার মা কিছু খাবার দিলেন। অনেক কষ্টে আমরা রাত কাটালাম।

সকালে ঘুরে ফিরে একটা বাসায় গিয়ে এক মহিলাকে আমি বললাম, মাসি, আপনাদের বাসায় আমাকে একটু থাকতে দেবেন? আমার কথা শুনে আমাকে বলল, কোথা থেকে এসেছো আমি বললাম বকশীগঞ্জ থেকে। তারপর, তিনি বললেন, তোমার আর কে কে আছে? আমি বললাম বাবা-মা, ভাই বোন। কথাগুলো বলতেই আমার চোখে জল এসে যায়। মাসি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, যাও সবাইকে নিয়ে এস। তখন দেরি না করে আমি চলে এলাম স্কুল মাঠে যেখানে রাতে ছিলাম। এসে মাকে বললাম, চলো মহেন্দ্রগঞ্জ মাসির বাসায় যাব। মা বলল, তুই মাসি কোথায় পেলি? বললাম, আমি দেখে এসেছি, তোমরা চলো আমার সাথে। তখন বাবা বলল, ঠিক আছে ও যখন বলেছে তখন ঘুরে দেখে আসো। মাকে সঙ্গে করে মাসির বাসায় গেলাম। মার সাথে মাসির কথা হলো। তারপর মা এসে সবাইকে নিয়ে এসে মাসির বাসায় উঠল। কিছুক্ষণ পর তারা আমাদের মুড়ি-চিড়া খেতে দিল।

তারপর বাবা বকশীগঞ্জ যেতে চাইল, যদি কিছু জিনিসপত্র সেখানে লোকে আনা যায়। আমিও বাবার সাথে যাব বলে জেদ ধরলাম। মা আমাদের যেতে দেবে না। তারপরও বাবার সঙ্গে চলে আসলাম। বাসায় এসে দেখলাম কেউ নেই। ঘরের কিছু জিনিসপত্র বাবা পোটলা বেঁধে নিল। আর সেই ফাঁকে আমি কয়েকটা কাঁথা ও বিছানার চাদর, কিছু জামা-কাপড় নিলাম। বাসা থেকে বের হয়ে বাজারের দোকানে এসে বসলাম কিছুক্ষণ। পরে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়ে দোকানের কাপড়-চোপড় ভরে নিয়ে রওয়ানা দিলাম। খুব ভালো লাগলো যে এগুলো দিয়ে অন্ত ত আমরা চলতে পারব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাজার পর হতে পারলাম না। সব নিয়ে গেল লুট করে, শুধু পোটলা দুটোই সাথে থাকলো। পরদিনই মহেন্দ্রগঞ্জ মাসির বাসায় হাজির হলাম। এর ফাঁকে মহেন্দ্রগঞ্জ নিরাপদ নয় বলে

মাইকিং করে দিল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভিতরে চলে যেতে বলল। যাই যাই করেও ৭ দিন পরে মাসিরাসহ চলে গেলাম পাতিসোড়া নামক এক জায়গায়। সেখানে সারিবদ্ধভাবে ছনের ঘর ওঠানো হয়েছে। সেখানে গিয়ে উঠলাম। আস্তে আস্তে অনেক রিফ্যুজি ক্যাম্প গড়ে উঠলো যেমন, মাস্তরমারী, কালাইপাড়া, ঝিকঝাক ইত্যাদি। শুরু হলো আমাদের জীবনযুদ্ধ। মাঝে মাঝে দেখতাম মুক্তিবাহিনীর লাশ ভারতে নিয়ে আসছে। মনে কৌতুহল জাগলো, কোথা থেকে লাশ নিয়ে আসে আমি তখন আমাদের ক্যাম্পের বাজারে ছোট একটা মুদির দোকান করি। দোকানে রাত ৯টায় হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামলো। গাড়িতে কয়েকজন মুক্তিফৌজ, সঙ্গে ২-৩ জন শিখ সৈন্য। মুক্তিফৌজের একজন আমাকে বলে, এই খোকা কলা কত করে হালি? আমি বললাম, এক টাকা। তখন বলে সবগুলো, বললাম, ত্রিশ টাকা। সবগুলো কলা নিয়ে সে ৩০ টাকা বের করে দিল। ঠিক তখন আমি মুক্তিফোর্সের একজনকে চিনতে পেয়ে বললাম, আপনি মফিজ ভাই না, তখন সে আমাকে বলল, তুমি নারায়ণ মামার ছেলে জবাবে আমি হ্যাঁ বললাম।

মফিজ ভাইয়ের বাড়ি বকশীগঞ্জ বাজারে। জানতে পারলাম কামালপুর বর্ডারে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। বাবা-মা ভাইবোন রেখে তারা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে অনেকেই তাদের আপনজনদের দেখতে পারেননি। স্বজন হারানো ব্যথা কি যে দুর্বিষহ সেটা যাদের ঘটেছে তারাই শুধু বুঝতে পারে।

দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়। ৩১ ডিসেম্বর আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম। এসে দেখি, বাড়িঘরের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাতে হলো। পরের দিন সকালে বাড়ি ভিটায় গিয়ে দেখি, বড় একটা বাংকার। সেখানে বদর বাহিনীর লোক থাকত বলে জানলাম। তারপর অনেক কষ্টে ঘরের টিন, খামগুলো জোগাড় করলাম এবং ছাপড়া তৈরী করে থাকতে শুরু করলাম। অনেকেই আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। বাবা দোকানের ব্যবস্থা করলেন আর সেই থেকে এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভালোভাবেই চলে যাচ্ছে। এরই মাঝে মাকে হারিয়েছি ১৯৮০ সালে এবং বাবাকে হারিয়েছি ১৯৯০ সালে। এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেই একাত্তরের দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা। আজ তা শুধু স্মৃতির দর্পণে প্রতিফলিত।

সূত্র: জ-২২৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
পিংকি রানী সরকার	**গোপাল সরকার**
বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পর্ক : বাবা
৭ম শ্রেণি, রোল : ২২	

রিকসা থেকে লাফ দিয়ে বাংকারে ঢুকলাম

আমার বাড়ি শ্রীবর্দী থানার অন্তর্গত গড়জরিপা ইউনিয়নে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকে পাকবাহিনীর অত্যাচার, নারী নির্যাতন ইত্যাদি কারনে এলাকায় সবার মনে আতংক সৃষ্টি করে। যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছিল তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয় এবং পরিবারের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। ভয়ে মহিলারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অনেকে চলেও যায়। আমি ও আমার ভাবিকে গ্রামের বাড়িতে না রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন মা-বাবা। ১১ ডিসেম্বর আমার বড় ভাই, ভাবি ও আমি জামালপুর শহরে আমাদের বাসায় গেলাম। পাশের বাসাটি মামার। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিনি সেখানে ছিলেন। বাড়িতে পরদিন সকালে একটি বাংকার খনন। আসার সময় আমাদের সঙ্গে কয়েক হালি ডিম, চাল-চিড়া ও গুড় দেয়া

হয়েছিল। বাংকার শেষ করে চিড়া দিয়ে নাশতা করে নিলাম। বিশেষ দরকারে বড় ভাই পাশের গ্রাম চন্দ্রাবাজ গিয়েছিল।

বেলা ১১টার দিকে যৌথ বাহিনীর ৬টি বিমান হঠাৎ করে শহরের আকাশে প্রবেশ করে। বিমানের শব্দে আমি ও ভাবি দিশেহারা হয়ে পড়ি। দৌড়ে বাংকারে গিয়ে আশ্রয়। দুইজনেই আল্লাহর নাম জপে কাঁদতে থাকলাম। আমাদের বাসা শহরের মাঝখানে। বিমান শহরের দক্ষিণ প্রান্তের পিটিআই সংলগ্ন এলাকায় বোমা নিক্ষেপ করল। বোমা যে স্থানে পড়েছে সেই স্থানটা গর্ত হয়ে একটা ছোট পুকুরে পরিণত হয়। বোমার আঘাতে একজন মহিলা নিহত হন। ওই সময় আমাদের মা-বাবা কেউ কাছে নেই। আধাঘণ্টার মধ্যে পুটলাসহ মানুষ রাস্তায় নেমে এলো শহর ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য। আমরা কী করব? ভাই তো এখনও ফিরল না। ভয়ে আর ভালো লাগে না। রান্না করাও হলো না।

জামালপুর থেকে উত্তরে নদীর অপর পারে চরপক্ষীমারী গ্রামে আমার বোনের শ্বশুরবাড়ি। শহরে বিমান হামলার কথা শুনে আমার দুলাভাই সাইকেলযোগে আমাদের দেখতে আসেন। তাকে দেখে বাসায় আর এক মিনিটও থাকতে চাইলাম না। ভাইও আসলেন। দুলাভাই বললেন, প্রস্তুত হও, রিক্সা নিয়ে আসি, আমাদের বাড়িতে চলো। ভাই আমাদের সঙ্গে যেতে চাইল না। মামার সঙ্গে থাকবে। ভাবি ও আমি যেইমাত্র রিকশায় উঠে বসেছি অমনি বিমানের বিকট শব্দ পাওয়ামাত্রই হাতের পুটলাগুলো ছুড়ে রিকশা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বাংকারে গিয়ে লুকালাম। মামাতো বোন হাসাহাসি শুরু করল আমাদের হা-হুতাশ দেখে। আমার আর হাসি আসে না। সেই সময় বিমান থেকে কোনো বোমা ফেলা হলো না। কয়েক চক্কর দিয়ে বিমান চলে গেল। আমাদের পুটলাগুলো পড়ে আছে। সব ডিম ভেঙে গেছে। দুলাভাইকে বললাম, আমরা আর রিকশায় যাব না। রিকশা থেকে নামতে দেরি হয়। তাই হেঁটেই যাব।

শহরের বাইরে দিয়ে ছোট রাস্তা ধরে রওয়ানা হলাম ভাবি, আমি আর দুলাভাই। মনে শংকা কখন আপার কাছে গিয়ে নিরাপদে পৌঁছাবো। শহর পেরিয়ে নদীর কিনারা দিয়ে অনেক দূর হেঁটে গিয়ে নদী পার হয়ে দুলাভাইদের বাড়ি। বেলা ৩টার দিকে ছোট নৌকা করে নদীর মাঝখানে গেলে আবার বিমানের বিকট শব্দ ভেসে আসে। এখন কি করি? এই বুঝি শেষ! আমার ধারণা হল, বিমান থেকে বুঝি আমাদের দেখছে, এই বুঝি বোমা ফেলল। বিমানগুলো আমাদের শহরের ওপর দিয়ে ঘুরছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেগুলো চলে গেল। অল্প হেঁটেই নদীর কাছাকাছি দুলাভাইয়ের বাড়িতে পৌঁছলাম এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

দুলাভাইয়ের বাড়ির অদূরে শেরপুর-টু-জামালপুর সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদীর ঘাট। লোকজন চলাচলের জন্য নৌকা আর যানবাহন চলাচলের জন্য যন্ত্রচালিত ফেরি দিয়ে নদী পার হয়ে জামালপুর ঘাটে যেতে হয়। দুলাভাইয়ের বাড়ি থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীর ঘাটে যাওয়ার পাকা রাস্তাটা বেশি দূরে নয়। বাড়ির সামনে ফসলের মাঠের পরেই পাকা রাস্তা। রাস্তার সব যানবাহন দুলাভাইদের বাড়ি থেকে দেখা যায়। রাস্তায় পাকবাহিনীর গাড়ি ঘন ঘন শেরপুর থেকে জামালপুরের উদ্দেশে আসতে থাকে। এতে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিল, গাড়ি শুধু এদিকেই আসছে শেরপুরের দিকে যাচ্ছে না। কারন কি? নদীর ঘাটে গাড়ির ভিড় জমছে। লোকমুখে শোনা গেল যে কামালপুর বর্ডার এলাকা থেকে যৌথ বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে পাকবাহিনী পিছু হটতে শুরু করছে।

ঘাটের উত্তরে পাকা রাস্তা সংলগ্ন বেশ এলাকাজুড়ে উঁচু জায়গায় পাকবাহিনী কতগুলো বাংকার করে। ওই জায়গাটা দুলাভাইয়ের বাড়ি থেকে মোটামুটি দেখা যায়। বিকালে ওই উঁচু এলাকায় বিমান হামলা হয়। বিমান চক্কর দিতে থাকে। সবাই পিড়ার কাছে শুয়ে পড়ি। বিমান থেকে ওই উঁচু জায়গায় একটা বোমা ফেলা হয়। কেউ হতাহত হয়নি। পাকবাহিনী সেখান থেকে নদীর ঘাটে অবস্থান নিয়েছিল বলে রক্ষা পায়। বিমান চলে গেলে এলাকাবাসী সেই স্থানে গিয়ে একটা পিতলের তলাবিহীন আঁকাবাঁকা ঘটির মতো বোমার খোসা নিয়ে আসে। দুলাভাইয়ের বাড়িতেও সেটা আনা হলে সবাই দেখলাম। বাড়িতে বাড়িতে সবাই তখন বাংকার তৈরির কাজে লেগে যায়।

বিমান চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই পাকবাহিনীর গাড়িগুলো শেরপুর থেকে অনবরত ঘাটে আসতে থাকে। নদী পারাপারের ব্যবস্থা কম থাকায় ঘাটে পাকবাহিনীর গাড়ির ভিড় জমতে থাকে। কামালপুর, বকশীগঞ্জ, শ্রীবর্দী এবং উত্তর এলাকা থেকে পিছু হটে হাজার হাজার পাকসেনা জমায়েত হলো নদী ঘাটে। আমি বিমান দেখে ও শব্দ শুনে এত ভয় পাওয়া সত্ত্বেও মনে মনে বললাম, আল্লাহ এই সময় যদি বিমানগুলো আসত ঘাটে, বোমা ফেলত তাহলে হাজার হাজার পাকবাহিনী মারা পড়ত। আর আমাদের দেশের মানুষ শান্তি পেত।

পাশের গ্রাম থেকে দুলাভাইয়ের এক আত্মীয় এসে খবর দিল।

এ এলাকায় থাকা ঠিক হবে না। যৌথবাহিনী উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে। পাকবাহিনী ও যৌথবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হতে পারে। এ অবস্থায় আপনারা মাঝখানে পড়বেন।

আপা আমাদের জন্য ভাত ডিমের তরকারি রান্না করছেন। দুলাভাই আমাদের সবাইকে তাড়াতাড়ি খেয়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। সারাদিন খাটুনির পর সবাই যখন খেতে বসলাম তখন মুক্তিবাহিনীর লোক এসে বলল, তাড়াতাড়ি এলাকা থেকে সবাই সরে যান। ডিম দিয়ে দুই কি তিন লোকমা ভাত মুখে দিয়ে সবাই উঠে পড়লাম। সবার মনে চিন্তা কখন গোলাগুলি শুরু হয়। সাধ্যমতো সবাই প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, কাপড়, লেপ নিলাম। দুলাভাই গরু মহিষ নিয়ে রওনা হলেন। সন্ধ্যা নেমে এল। শুধু আমরা যে রওয়ানা হলাম তা নয়, এলাকার সবাই রাস্তায় নেমে পড়ল। নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে, গরু-ছাগল, মহিষের ভিড় রাস্তাঘাটে। অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে, যতই উত্তর দিকে যাই, রাস্তার দুই ধারে মুক্তিবাহিনীর আগমন তত বেশি দেখা যায়। তারা বলে, আপনারা তাড়াতাড়ি দূরে সরে যান। মাইল তিনেক হেঁটে দুলাভাইয়ের এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে হাঁফ ছাড়ি। ভাবি, আর বুঝি মরতে হবে না।

আমাদের দেখে দুলাভাইয়ের মামি রান্না করলেন ভাত, ডাঁটা ভাজি ও খেসারির ডাল। নিশ্চিত মনে আমি পেট ভরে ভাত খেলাম। শীতের রাত, একটু আরাম করে ঘুমানো যাবে বলে মনে করলাম। দুলাভাইয়ের মামা বাইরে থেকে এসে জানায় যে, মুক্তিবাহিনী বলেছে, এই এলাকায় লোকজন থাকা নিরাপদ নয়। মনে মনে বলতে লাগলাম, হায় আলাহ, মরলে মরবো কিন্তু হেঁটে হেঁটে শীতের রাতে অন্ধকারে আর কোথাও যেতে পারব না। মামা মামিরা অন্যত্র যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। মনের দুঃখে তাদের সাথে আবার রওয়ানা দিলাম। অনেক দূর হেঁটে গিয়ে উঠলাম দুলাভাইয়ের জেঠাতো বোনের বাড়িতে। রাত তখন ১১টা। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। প্রত্যেক ঘরের সারা মেঝেতে খড় দিয়ে বিছানো। যে যেভাবে পেরেছে শুয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে একটা লেপ ছিল। লেপের নিচে ভাবি, আমি আর আপা শুয়ে পড়লাম। দুলাভাইয়ের শোয়ার ব্যবস্থা হলো একটা চকিতে।

১৩ ডিসেম্বর। আমরা জামালপুর শহর থেকে ৬-৭ মাইল উত্তরে অবস্থান করছি। বিমান এই এলাকার ওপর দিয়ে জামালপুরের দিকে যায়। কোথায় বোমা ফেলে বোঝা না। রান্না করার জায়গা নেই। গোসলের ও বাথরুমের সমস্যা, কারণ বাড়িতে লোকের অভাব নেই। দূর-দূরান্ত থেকে গরু-ছাগল মহিষসহ সবাই এসেছে।

গভীর রাতে একটা শব্দ হলো। কান্নাকাটির শব্দও ভেসে এল। দুলাভাই চিৎকার করে বলতে থাকল, সবাই পিড়ার কাছে শুয়ে পড়। এটা শেল পড়ার শব্দ। বিছানা ছেড়ে সবাই ঘরের পিড়ার কাছে শুয়ে পড়লাম। আতংকে রাত কেটে গেল। সকালে শুনতে পেলাম বাড়ির অদূরে একটা শেল পড়ে ২টা গরু ও একজন লোক মারা গেছে।

১৪ ডিসেম্বর। আমার ভাই অতি কষ্টে খুঁজতে খুঁজতে বেলা ১২টার দিকে আমাদের সন্ধান পেল। বেলা ২টার দিকে সে আমাদের প্রস্তুত হতে বলল। গ্রাম এলাকার পথ ধরে গরুরগাড়ি করে উত্তর দিকে রওয়ানা দিলাম। দুলাভাই, আপা আমাদের সঙ্গে আসলেন না। কামারের চর গ্রামে আমার ছোট ভাবির বাপের বাড়িতে এলাম। সেখানে এসে শুনতে পেলাম উত্তর এলাকা পুরোপুরি পাকবাহিনী মুক্ত হয়ে গেছে। শেরপুর যৌথ বাহিনীর দখলে। এখানে আমরা রাত্রি যাপন করলাম।

১৫ ডিসেম্বর। শেরপুর হয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যেতে হয়। বড় ভাই শেরপুরের পরিস্থিতি বেশ ভালো দেখে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিল। ভাবির বাবা একটা গরুর গাড়ি ভাড়া করলেন। আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর রওয়ানা হবো বলা হলো। সেই রাত্রি আমরা নিরাপদে অতিবাহিত করলাম।

১৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে গরুর গাড়িতে আমাদের গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। শেরপুর শহরে ঢুকেই দেখতে পেলাম অসংখ্য ভারতীয় সেনা। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রহাতে ঘোরাফেরা করছে। বিজয়ের পাতাক উড়ছে আমাদের দেশে।

সূত্র: জ-২৪৫

সংগ্রহকারী :
মুনিয়া ইসলাম
বকশীগঞ্জ উলফাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
৮ম শ্রেণি, রোল : ৪৯

বর্ণনাকারী :
মো. মাহফুজুর রহমান মাফুজ
বয়স: ৪৭ বছর

সাতজন মুক্তিযোদ্ধার জীবন রক্ষাকারী

আমার আব্বা বললেন, গুলিবর্ষণ করে পাকসেনারা যখন লোক মারতে লাগল তখন এক রাতে শেখ মণি, তোফায়েল আহমেদ পালিয়ে আমাদের বগুড়া গ্রামে এসে উপস্থিত হন। তারা ভারতে চলে গেলে আমার বড় ভাই শাহজাহান ও আমার চাচা সুলতান মাহমুদ আমাকে বলল, চল আমরা ভারতে চলে যাই। পাকবাহিনী আমাদের কাউকে বাঁচতে দেবে না। এপ্রিল মাসে আমরা হিলি বর্ডার পার হয়ে ভারতের শরণটিলা গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা একটি ক্যাম্প তৈরি করে। বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুর এলাকার লোকেরা পাকবাহিনীর অত্যাচারে দলে দলে ভারতে যেতে থাকে। শরণটিলায় তাদের একত্রিত করা হয়। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আমাদের মতো ছেলেদেরকে নিয়ে ট্রেনিং শুরু হয়। তখন আমার বয়স খুবই কম, এইচএসসি প্রথম বর্ষে পড়ি। ট্রেনিংয়ের সময় আমাকে এসএলআর দেয়। এসএলআরের অনেক ওজন যা বহন করা আমার পক্ষে কঠিন হতো। ৯ এমএম এসএমজি ও গ্রেনেড নিক্ষেপ ট্রেনিং করি। এর মধ্যে শুনতে পাই সারা দেশে পাকবাহিনী আমাদের প্রিয় বাঙালিদের মেরে শেষ করছে। বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। যাদের ছেলেরা ভারতে গেছে তাদের পিতামাতাকে গুলি করে মারছে। এই সব কথা শুনে বাংলাদেশে আসার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। তখনও পুরোপুরিভাবে ট্রেনিং শেষ হয়নি। ক্যাম্প হতে আদেশ হলো পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে।

একদিন আমাদের মধ্য থেকে ৫০-৬০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার সাইডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা মাত্র ২০ জনের মতো ফিরে আসে। বাকিরা সব শহীদ হয়। এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। আমাদের এলাকায় তখন বেশ কিছু রাজাকার তৈরী হয়েছে। তাদের কাজ ছিল পাকবাহিনীকে সাহায্য করা এবং যারা মুক্তিযুদ্ধে গেছে তাদের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনদের নির্মমভাবে হত্যা করা।

আমাদের পাশের গ্রামে একজন ডাক্তার ছিল। সে ডাক্তার এবং তার ছেলেরা ছিল রাজাকার। তখন আমাদের সাতজনের একটা গ্রুপ করে এলাকায় পাঠিয়ে দেয়। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল তাদের হত্যা করা। আমরা তাই করেছিলাম। হিলি বর্ডার থেকে একটু দক্ষিণের ছায়াঢাকা জায়গা দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকি। কিছু দূর এসে দেখি পাকবাহিনী রাস্তা দিয়ে বর্ডারের দিকে যাচ্ছে। ওই সময় লুকানোর স্থান খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমাদের নিকট যে অস্ত্র ছিল তা দিয়ে সম্মুখ যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। এমন সময় দেখি একটি ছনের ঘর। তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে ঢুকি। সেখানে ছিলেন একজন অন্ধ মহিলা। উনি বললেন, তোমরা কি মুক্তিযোদ্ধা? আমরা বললাম, জি মা। বৃদ্ধা মা আমাদেরকে চৌকির নিচে যেতে বললেন এবং উনি একটি কোরআন শরিফ নিয়ে দরজায় পাটি বিছিয়ে পড়তে থাকলেন।

ঠিক ওই সময় পাকবাহিনীর কিছু সৈনিক প্রতিটি ঘরে চেক করে যেতে লাগল। কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা! এই বৃদ্ধ মহিলার ঘরে আর ঢুকল না। যখন পাকবাহিনী অনেক দূরে চলে গেল, তখন বুড়ি মা বললেন, বাবারা, তোমরা কাছে এসো। কুত্তারা চলে গেছে। তখন আমরা বুড়িমার পা ধরে কান্না শুরু করলাম ও সম্মানের সাথে তাকে সালাম করলাম। আল্লাহ আমাদের প্রতি কত মহান হয়েছিলেন সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম। ওই বৃদ্ধা মা শুধু একজন মহিলা নন। উনি সাতজন মুক্তিযোদ্ধার জীবন রক্ষাকারী। সেদিন তার নাম-ঠিকানা না রেখে কি যে ভুল করেছিলাম! আল্লাহ যেন ওই মাকে বেহেশতবাসী করেন। ওই মুহূর্তে আমরা স্থান ত্যাগ পরে লক্ষ্যস্থলের দিকে চলে যাই।

এরপর থেকে শুরু হয় পাকবাহিনীর ওপর হালকা আক্রমণ। বগুড়ার জেলেপাড়া হতে সাতগ্রাম পাকা রাস্তায় পাকবাহিনী যখন টহল দিচ্ছিল তখন আমরা দূর থেকে তাদের ওপর এসএলআর-এলএমজি দ্বারা গুলিবর্ষণ করি। পাকবাহিনী রাস্তার ডানে বামে পালাতে থাকে। এবং বগুড়া হতে আরও ৫-৬ ট্রাক পাকবাহিনী ওই এলাকায় এসে বাড়িঘর সব তছনছ করে দেয়। তখন থেকে আমাদের যুদ্ধের নিয়ম কিছুটা পরিবর্তন করি। এরপর থেকে পাকবাহিনীর ছোট ছোট ক্যাম্পের ওপর অতর্কিতে হামলা চালাতে থাকি। এইভাবে চলতে থাকে ৯টি মাস। আমরা মাঝেমধ্যে না খেয়ে থেকেছি, বাড়ির জন্য অনেক চিন্তা করেছি। এই মুক্তিযুদ্ধের গল্প শেষ করতে হলে মনে হয় ৯টি মাসই লাগবে।

এই কথা বলে আব্বু উঠে পড়লেন। তখনও আব্বুর চোখের কোণায় টলটলে পানি।

সূত্র: জ-৪০৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
নুসরাত জাহান (নিপা)	**মো. নূর মোহাম্মদ**
বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়	পো : কেন্দুয়া-কালিবাড়ি
শ্রেণি : ৭ম	জেলা : জামালপুর
গ্রাম : কেন্দুয়া, পো : কেন্দুয়া কালিবাড়ী, জেলা : জামালপুর	বয়স : ৫৩

শেলের আঘাতে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন শহীদ হন

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা কয়েক বন্ধু পরামর্শ করে ঠিক করলাম সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। তখন আমি আশেক মাহমুদ মহাবিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। ছাত্র ইউনিয়ন হতে আমি ছাত্র সংসদের নির্বাচিত কমনরুম সম্পাদক ছিলাম। কাজেই আমার ওপর ইসলামী ছাত্রসংঘের নজর ছিল। আমাদের পাশের গ্রামে একজন বদর ছিল । সে সবসময় আমার চলাফেরার প্রতি নজর রাখত।

এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহ আশেক মাহমুদ মহাবিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর ও আমরা তিন বন্ধু ভারতের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। অতি কষ্টে সন্ধ্যায় আমরা বাহাদুরাবাদ ঘাটে পৌঁছলাম। পাক হানাদার বাহিনীর সুতীক্ষ্ণ নজর ছিল। নৌকার ওপর তারা হেলিকপ্টার হতে গুলিবর্ষণ করত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পাকবাহিনীর নজরে পড়লাম। নৌকার মাঝি খুব সাহসী ও দক্ষ ছিল। আমাদের তিন বন্ধুকে কোমরে রশি বেঁধে নৌকার সাথে বেঁধে দিল আর প্রফেসর সাহেবকে পাটাতনের নিচে শুইয়ে দিল। আমরা কখনোবা ডুব দিয়ে, কখনো গা ভাসিয়ে যমুনা নদীর বিপদসংকুল এলাকা পার হয়ে যাই। একদিন এক রাতে নৌকায় যাত্রা শেষে পাথরের চর নামক স্থানে ভারতের সীমান্তে পৌঁছি। সে এলাকায় শত্রু ছিল। কিন্তু আমরা নিরাপদে সে জায়গা থেকে মুক্তিবাহিনী এক ক্যাম্পে আসি। ক্যাম্পের অধিকাংশ যুবক জামালপুরের ছিল। তিনদিন পরই আমাদের ট্রেনিংয়ের জন্য তুরায় নিয়ে যায়। এক মাস ট্রেনিং দেওয়ার পর আমাদের ৩৩ জনকে ধানুয়া-কামালপুরের সর্বদক্ষিণে পজিশন দেয়। কারণ আমরা বেশির ভাগই মেট্রিক ও আইএ পাস ছিলাম। বাংকার আক্রমণে রেকি পার্টির জন্য শিক্ষিত ও চতুর লোকের প্রয়োজন হয়।

আমরা ক্যাপ্টেন আজিজ সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক ১১নং সেক্টরের ধানুয়া-কামালপুরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমাদের ১১ জন করে ৩টা গ্রুপ করা হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন কর্নেল আবু তাহের। তারিখ মনে নেই। আমাদের ওপর আদেশ হলো ধানুয়া-কামালপুরের ১, ২, ও ৩নং বাংকার কি অবস্থায় আছে রেকি করার জন্য। আমরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে ২ দিনে কখনো কামলা সেজে, কখনো মাছ ধরার ছলে অতি কষ্টে কোন জায়গা দিয়ে আক্রমণ করে কোন পথ দিয়ে নিরাপদে বের হতে পারব এবং হানাদার বাহিনীর সংখ্যা ও কী কী হাতিয়ার ব্যবহার করে, সবই জানতে চেষ্টা করি। রাত ১১টার সময় এ ক্যাম্পের ১২০-১২৫ জন মুক্তিযোদ্ধা ও কিছু সামরিক বাহিনীর সদস্যসহ একযোগে পাকবাহিনীর বাংকার আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত হলো। যুদ্ধে স্বয়ং সেক্টর কমান্ডার নেতৃত্ব দেবেন। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন সাহেব বাংকারে গ্রেনেড নিক্ষেপ করার দায়িত্ব পেলেন। মর্টার শেল নিক্ষেপ যৌথবাহিনীর দায়িত্বে।

রাত ১২টায় আমরা পাকবাহিনীর ক্যাম্প ও বাংকার আক্রমণের সকল প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ করলাম। সারারাত্রি তুমুল যুদ্ধের পর সকালে আনুমানিক ৮-৯টার সময় তিন বাংকারেই পাকবাহিনীর বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন শেলের আঘাতে শহীদ হন। সেই যুদ্ধে এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীর এমবুশে পড়লে উপায় না দেখে সেক্টর কমান্ডার তাহের বীর বিক্রমে পাকবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং এমবুশ হতে মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ষা করেন। সেই যুদ্ধে তাহের সাহেব একটি পা হারান।

একদিনের কথা মনে পড়ে। তারিখ মনে নেই। কুয়াশা পড়ছে এইটুকু মনে আছে। কুয়াশার ভেতরে ধানুয়া-কামালপুরের স্কুল হতে একটু দক্ষিণ দিকে আমরা ৩৩ জন মুক্তিযোদ্ধা ও ৩ জন সামরিক বাহিনীর লোক বাস রোডের কাছাকাছি পাকবাহিনীর গাড়ি আসবে বলে ক্ষেতের নিচু জায়গায় পজিশন নিয়ে আছি। আমাদের যুদ্ধ ছিল গেরিলা পদ্ধতির, কাজেই পাকসৈন্যদের ভুল পথে নেয়াই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আমরা বিপরীত দিকে পাঠিয়ে দিলাম। তাদের কাজ ছিল পাকবাহিনীর গাড়ির বিপরীত দিকে ফায়ার করা। পাকবাহিনী ওই দিকে বৃষ্টির মতো একতরফা গুলি করছে। যখন কোনো পাল্টা গুলি খায় নাই তখন নিঃসন্দেহে এদিকে আসছিল। তখন তারা আমাদের এমবুশে পড়ে গেল। আমরা সাথে সাথে ফায়ার শুরু করলাম। সেই ফায়ারে পাকবাহিনীর একজন মেজরও মারা গিয়েছিল। চরম মার খেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা মর্টার শেল মারতে লাগল। আমরা সবাই লায়িং পজিশন হয়ে গুলি ছাড়ছি। এমন সময় একটা মর্টার শেল কাজল নামের এক বীর মুক্তিযোদ্ধার ওপর এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে শহীদ হয়। কামালপুরের তিনজন ছেলে গুরুতর আহত হলো। সেই শহীদের লাশ আমরা ধানুয়া-কামালপুরে সমাহিত করি।

আমাদের সবচেয়ে কঠিন সময় গেছে নভেম্বর মাসে। তখন ভারতের সৈন্যরা প্রতি রাত্রে বর্ডারে আসত। আমাদের সারারাত্রের ডিউটি ছিল রাস্তা নিরাপদ রাখা এবং গাড়িগুলো নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করা। তখন ছিল গারো পাহাড়ে কনকনে শীত। আমাদের গায়ে ছিল গেঞ্জি অথবা শার্ট পা ছিল খালি। আমার মনে পড়ে রাজপুত্রের মতো এক মেজর সাহেব একদিন রাত্রে গাড়ি হতে নেমে এসে আমাদের এরকম অবস্থায় দেখে গাড়িতে উঠতে বললেন। তখন আমরা জবাব দিয়েছিলাম, কমান্ডার সাহেবের হুকুম নেই গাড়িতে উঠবার। তখন বলেছিলেন, তোমরা সত্যিই দেশ স্বাধীন করতে পারবে। আমাদের ওপর বিরাট দায়িত্ব ছিল গাড়ি এবং ভারতের সৈন্য যেন আমাদের পেট্রোল এলাকায় নিরাপদে থাকে। কাজেই আরাম করার কোনো উপায় ছিল না। ১১ নং সেক্টরের ধানুয়া-কামালপুরে ৯ মাসের ভেতরে প্রতিদিন যুদ্ধ হয়েছে। আমাদের প্রতি ৩৩ জনে একটি এলএমজি, ৪-৫টা এসএমজি ৪-৫টা এসএলআর ও ৩০৩ রাইফেল থাকত, কোমরের গামছায় বাঁধা ৩-৪টা করে হ্যান্ড গ্রেনেড ও একশ রাউন্ড গুলি থাকত। আমাদের অস্ত্রের চেয়ে মনোবল ছিল অনেক বেশি।

নভেম্বর মাসের শেষে দিকের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন ধানুয়া-কামালপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর সমস্ত রাস্তাঘাট-বাংকার ঘেরাও করে আছে। কোনো প্রকার খাবার ও অস্ত্র-সরঞ্জাম যেতে-আসতে পারে না।

এমন সময় খবর এল ধানুয়া-কামালপুরে জাতিসংঘের গাড়ি আসবে। ক্যাপ্টেন আজিজ সাহেব আমাদের ১০ জনের একটি গ্রুপকে বাস-রোডের দায়িত্ব যাতে জাতিসংঘের গাড়ি আসতে না পারে সে ব্যবস্থা নিতে। ১০ জনকে আখ ক্ষেতের ভেতর দিয়ে প্রায় আধামাইল ক্রলিং করে যেতে হবে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত। আমরা যথাসময়ে রওনা হলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর আখ ক্ষেতের ভেতর ৮ জন বদর ও ২ জন পাকবাহিনীর সৈন্যকে লুকিয়ে থাকতে দেখলাম। ওরা মনে করছে, আমরা ওদের ধরতে যাচ্ছি। কিন্তু ওরা যে লুকিয়ে আছে তা আমরা দেখি নাই। প্রাণের ভয়ে ওরা আমাদের দিকে ৩-৪ রাউন্ড গুলি ছুড়লো। আমরা কামালপুরে যে জায়গায় যুদ্ধে যেতাম সাথে কভারিং পার্টি থাকত। যাহোক আখ ক্ষেত ঘেরাও করে বিনা যুদ্ধে অতি সহজে তাদের ধরতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমাদের লক্ষ ছিল বাস রোড। আমরা যথারীতি বাস রোডে যেয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ৭-৮টি জাতিসংঘের সাদা গাড়ি আসলে আমরা বললাম, সমস্ত ধানুয়া-কামালপুর মুক্তিযোদ্ধারা ঘেরাও করে আছে। আমরা কিছুতেই ওদের জন্য খাবার নিয়ে যেতে দেব না। কিছু কথাকাটাকাটির পর সেই গাড়ি ফেরত পাঠাই। আমি সেদিনই অনুভব করেছিলাম যে, আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে গেছি। ৮ জন বদরবাহিনী ও ২ জন পাকসেনা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করা– আমার যুদ্ধের সময়কালের স্মরণীয় ঘটনা।

ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখ হতে পাঁচ তারিখের মধ্যে ধানুয়া-কামালপুরের পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর আমরা জামালপুরের উদ্দেশে রওনা দিই। পথিমধ্যে ঝিনাইগাতী, আহম্মদনগর, বকশিগঞ্জ ও শেরপুরে তুমুল যুদ্ধের পর পাকবাহিনী পিছু হটে জামালপুরে অবস্থান নেয়। আমরা প্রায় ২ হাজার মুক্তিযোদ্ধা, সেনাবাহিনী ও যৌথবাহিনী প্রবল আক্রমণে ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখে পাকবাহিনীর পিটিআই ক্যাম্প অনেক ক্ষতি সাধনের পর মুক্ত করি। জামালপুর মুক্ত হয়। তারপর আমরা তৎকালীন জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করে শত্রু মুক্ত করি এবং ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে আমরা পুরোপুরি জামালপুর নিয়ন্ত্রণে আনি।

প্রকাশ থাকে যে, আরো অনেক ঘটনা ও যুদ্ধের চিত্র লেখা অসমাপ্ত থেকে গেল। এটা একদিকে আমাদের যেমন ভারাক্রান্ত করে তুলে আবার অন্যদিকে আনন্দিতও করে। অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন আমরা একটি স্বাধীন দেশে বাস করি।

সূত্র: জ-৪০৬

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তাসরীনা তানিয়া (পিংকি)	**মো. আব্দুস সালাম**
বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : কেন্দুয়া, পো : কেন্দুয়া-কালিবাড়ী
শ্রেণি: ৭ম	জেলা : জামালপুর
গ্রাম : কেন্দুয়া, পো : কেন্দুয়া কালিবাড়ী	বয়স : ৫৩, সম্পর্ক : কাকা

পাশেই ছিল আহত জয়েন উদ্দিন

এলাকায় আলবদরদের অত্যাচারের ফলে আমাদেরকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হয় শূন্য হাতে। সেই স্মৃতি আজ আমার কিছুটা স্মরণ হচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শূন্য হাতে চলে যাই হাজীপুর বাজারে। সেখানে গিয়ে একজন পরিচিত লোকের কাছ থেকে ১৫ টাকা ধার নিয়ে শ্যামগঞ্জ কালিবাড়ী যাই। সেখানে আমরা ৪০ জন একত্র হয়ে নৌকাযোগে ভারত মুখে যাত্রা করি। যাত্রাপথে একটা জায়গায় আমাদের নৌকা আটকে যায়। কারণ হলো, হঠাৎ করে পাকহানাদার বাহিনীর একটা টহল দল সামনের দিকে আসছিল। এ সময় আমাদের কাছে কোনো অস্ত্রপাতি ছিল না। মাঝি আমাদেরকে নদীর ধারে কাশফুলের ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখে। পাকহানাদার বাহিনী স্পিডবোট দিয়ে নদী পার হলো। আলাহর অসীম কৃপায় আমাদেরকে তারা দেখতে পেল না। তারা যাওয়ার পর আমাদের নদীপথ শত্রুমুক্ত হলো।

আমাদের নৌকা আবার ভারত মুখে যাত্রা শুরু করল। আমরা কামালপুর বর্ডারে পৌঁছি সন্ধ্যা ৭টায়। নৌকার মাঝি রাতেই আমাদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। আমরা শোয়ার সাথে সাথে ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো গুলি চলে যায়। চারদিকে শুধু গুলির গর্জন শোনা যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরের দিন আমাদেরকে সকাল ৭টায় কালাইপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে নেয়া হয়। সেখানে আমরা কিছুদিন অপেক্ষা করলাম। এরপর আমাদের রিক্রুট করে নিয়ে যায় ঢালুতে। সেখানে আমরা ৭ দিন থাকার পর নিয়ে যায় তুরায়। ১১ নং সেক্টরে আমরা এক মাস প্রশিক্ষণ নেই। আমাদের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু তাহের। আমাদের কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন রহমতুলাহ্।

প্রশিক্ষণের পর আমাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়। ফরেস্ট অফিসের সামনে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে আমরা ১২০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। সবাই মিলে আমরা ৭ জন পাকহানাদারকে গুলি করে হত্যা করি। মুক্তিবাহিনীর ৫ জন সদস্য আহত হয়। এর মধ্যে আমার পাশে ছিল মুক্তিযোদ্ধা জয়েন উদ্দিন। আহত জয়েন উদ্দিনকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেসামরিক চিকিৎসার জন্য ডাক্তার নজরুলের কাছে নিয়ে যাই। তিনি তার চিকিৎসা করেন। আমরা ভারতে তিন দিন অবস্থান করি। সেখান থেকে আমাদের আবার বাংলাদেশে বারোয়ামারি নামক স্থানে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে আবার পাকবাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধটা ছিল মাত্র আধা ঘণ্টার। তারপর ফরেস্ট অফিস ও ধানুয়া কামালপুর নামক দুই জায়গায় রাস্তার মাঝখানে মাইন পুঁতে রাখি। কিছুক্ষণ পর পাকবাহিনীর একটি গাড়ি রাস্তার মাঝখানে আসার সাথে সাথে মাইনটি বার্স্ট হয়ে যায় এবং গাড়িটি ছিটকে বিশ হাত দূরে মাঠে উলটে পড়ে। গাড়িটির ভেতরে ১০ জন পাকসেনা ছিল। তাদের মধ্যে সাথে সাথে ৭ জনের মৃত্যু ঘটে এবং তিনজন পালিয়ে যায়।

এরপর আমরা শেরপুর চলে আসি। শেরপুরের উত্তরে আমরা গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় নিই এবং একরাত অবস্থান করি। সেখান থেকে আমরা চলে আসি নান্দিনার মহেশপুর কালীবাড়ি এবং আলীর খেতে এ্যামবুস করি। এদিকে জামালপুরে তুমুল যুদ্ধ হয়। পাকবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এমন অবস্থায় আমাদের এ্যামবুসে পড়ে যায় তিনজন পাকহানাদার। তাদের ওপর সাথে সাথে গুলিবর্ষণ করা হয়। অবশেষে জামালপুরের মাটি শত্রু মুক্ত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেই দিন থেকে আমাদের দেশের মাটিতে এবং সবুজের সমারোহ আবার জেগে ওঠে। লাল সূর্যটাকে আমরা ছিনিয়ে আনলাম। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

সূত্র: জ-১৮২৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মাসুদ রানা	**মো . আফছার আলী (মুক্তিযোদ্ধা)**
বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : ডেফুলীবাড়ী, পো : ডেফুলীবাড়ী
নবম শ্রেণি	থানা ও জেলা : জামালপুর

তোমরা সরে দাঁড়াও

আমার বাবা এম এ কাইয়ুম ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তারা যেভাবে মেলান্দহ থানা অপারেশন করেন সেই ঘটনাটি এখানে লিখছি।

মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প হতে বাবাসহ দশজনকে নিযুক্ত করা হয় মেলান্দহ থানা আক্রমণের জন্য। উক্ত থানায় পাঁচজন পাকিস্তানির নেতৃত্বে শতাধিক রাজাকার, আলবদর দ্বারা নিরীহ বাঙালির ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চলছিল। তাদের খতম করা এবং পাকিস্তানি প্রশাসনের এই থানাকে অকেজো করে প্রশাসনকে স্থবির করাই এই অপারেশনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার বাবা এবং তার সাথের মুক্তিযোদ্ধারা মহেন্দ্রগঞ্জ হতে নৌকাযোগে ইসলামপুর থানার গোয়ালের চরের দক্ষিণের এক চরে আসেন এবং সেখানে দিনযাপন করে আবার রাত্রিতে রওনা হন। দুরমুঠ

স্টেশনের পূর্ব উত্তর দিকে তারা নৌকা হতে নেমে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধরে হেঁটে স্টেশনের দিকে আসতে থাকেন। উত্তর দিকে ছোট একটি মাটির রাস্তা রেললাইন অতিক্রম করেছে। এই রাস্তা দিয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় তারা একটু দূরে দেখতে পান লাঠি হাতে অনেক লোক রেললাইন পাহারা দিচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য করে মুক্তিযোদ্ধারা বলে, আমরা রেললাইন পার হয়ে পশ্চিম দিকে চলে যাব, তোমরা সরে দাঁড়াও। তারা দৌড়ে পালিয়ে যায়। গ্রামের নিরীহ লোক ওরা । রেললাইন পার হয়ে রাত্রের মধ্যেই মেলান্দহ থানা হতে দক্ষিণে তিন চার মাইল পরে তাদের একজনের নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থান করেন।

আমার বাবা এবং তাদের একজনকে নিয়ে মেলালন্দহ থানা কিভাবে আক্রমণ করা যায় তা রেকি করতে যান এবং সন্ধ্যায় অবস্থানরত বাড়িতে এসে আলোচনা করে আক্রমণের প্ল্যান তৈরী করে রাত ১১টায় রওনা হন। রাত ১২টার মধ্যে তারা থানার পূর্ব পার্শ্বে পৌঁছে যান ও থানায় গ্রেনেড ও বিভিন্ন অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ চালান। ১০ মিনিট গ্রেনেড হামলা ও ফায়ার করার পর তারা থানায় উঠে পড়েন ও থানা পুড়িয়ে দেন। আনন্দের বিষয় হলো , পাকবাহিনী পাল্টা আক্রমণ না করে পালিয়ে যায়। তারা সেখান থেকে পাঁচটা রাইফেল, অনেক দরকারি কাগজপত্র, পুলিশের পোশাক এবং আরও অনেক জিনিস দখল করেন। পরে সেগুলো ভারতে জমা দেন।

সূত্র: জ-১৫৯

সংগ্রহকারী ::	বর্ণনাকারী :
নাজমুন নাহার	**এম এ কাইয়ুম**
জিলবাংলা সুগার মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	থানা : দেওয়ানগঞ্জ, জেলা : জামালপুর
শ্রেণি: ৭ম, রোল : ৭	বয়স : ৫০

আমরা পোড়া বাড়ি দেখতে যাব

আমি আমার দাদার কাছে গেলাম। তাকে মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, আজ যে কথা বলছি, তা শুনলে তোদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা শোন তাহলে :

সেই যুদ্ধের সময় আমি ও আমার পরিবারবর্গ মিলে ছিলাম কাঠারবিল নামের এক গ্রামে। তখন কাঠারবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিবাহিনী ঘাঁটি করে। তাই আমাদের গ্রামের ভয় একটু বেশি ছিল। আমি তোর দাদি, বাবা ও চাচাদের নিয়ে আমখাওয়ার দিকে রওনা হলাম। আমরা যার বাড়িতেই যাই না কেন, আপন হোক আর পর হোক, সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তাই আমরা তাদের ডেকে বললাম, আপনারা যাবেন না, আমরা চলে যাচ্ছি। সবাই মিলে আবার চললাম আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ির দিকে। শুনলাম সেখানে নাকি পাকবাহিনীর হামলা কম হবে। তাই তাদের ওই আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে আসলাম। মাঝে মাঝে আমি তোর দাদি ও সন্তানদের দেখে আসতাম। আর আমি মুক্তিবাহিনীকে অন্যের সাহায্যে রান্না করে খাওয়াতাম।

আমাদের গ্রামে হামলা হতে পারে। এই আশংকায় মুক্তিবাহিনীর লোকেরা সকলকে সজাগ থাকতে বলেন। যখন পাকিবাহিনী এলাকায় হামলা করে তখন আমি আমার বাবাকে নিয়ে আন্ডারচর নামে একটি গ্রামের দিকে রওনা হই। কিছুদূর যাওয়ার পর পথিমধ্যে আমার বড় ভাইয়ের সাথে দেখা হয়। আমি বাবাকে বড় ভাইয়ের সাথে দিয়ে দিলাম। তিনি বাবাকে নিয়ে আন্ডারচর গ্রামে চলে গেলেন। এদিকে পাকবাহিনী হামলা করেছে আমার শখ হলো একটু হামলা দেখে আসি। দেখলাম গ্রামের সমস্ত লোক দৌড়াচ্ছে। আমিও তাদের পিছু পিছু দৌড়ালাম। যখন নদী পার হই তখন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমাকে ডেকে বললেন, সবাইকে বল ভয় নেই। আমিও সবাইকে তাই বললাম।

আমাদের ওখানকার অনেক দোকানপাট ঘরবাড়ি আলবদরদের কথায় পাকসেনারা পুড়িয়েছে। আমি বাবার কাছে গেলাম, সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তারা জিজ্ঞাসা করলো এখনো কি পাকবাহিনী আছে? না, এখন নেই বললাম

তাদের। তাই তারা বলল, আমরা পোড়া বাড়ি দেখতে যাব। আমি বললাম, চলো। গ্রামে এসে দেখলাম অনেক বাড়ি পোড়া। আমাদের বাড়িও পুড়িয়ে দিয়েছে দেখে খুব কষ্ট লাগলো। বাড়ির সব কাঠ, ধান, তক্তা, বাক্স, সিন্দুক ইত্যাদি নানা রকম কাঠের জিনিস পুড়ে ছাই। আমি ও বাবা মিলে সে সব জিনিস দেখলাম।
এরপর আমরা অনেক দুঃখ-কষ্টে জীবনযাপন করি। তখন আমি ও তোর দাদি মিলে আমখাওয়া থেকে চকপাড়া গ্রামে আসি এবং খেয়ে না খেয়ে জীবনযাপন করি। আর যা ধান ছিল আমরা আমখাওয়া নিয়ে যাই এবং আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়িতে রান্না করে, খেয়ে জীবন যাপন করি।
ওদিকে যুদ্ধ চলছে। আমাদের গ্রামেও যুদ্ধের প্রস্তুতি চলে। আমরা সবাই আবার সে গ্রাম ছেড়ে বাঙালি পাড়ায় চলে আসি। সেখানে প্রায় এক মাস থাকি। আমি শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দিই। যুদ্ধের সময় ভয়ানক দৃশ্য আমার সহ্য হয় না। যেমন, কারও লাশ আবার কারও আহত হওয়ার দৃশ্য। তবুও আমি মনে পাষাণ বেঁধে থাকি। আমি মাত্র দুই দিন যুদ্ধ করি। তারপর বাংলাদেশ পুরোপুরি স্বাধীন হয়। তখন থেকেই শুরু হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা আজ স্বাধীন।

সূত্র: জ-১৬১

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
ফজলে রাব্বী	**মোঃ নুরুল হুদা সরকার**
জিলবাংলা সুগার মিলস্ হাই স্কুল	গ্রাম : কাঠার বিল, ডাক : কাঠার বিল
৭ম শ্রেণি, রোল : ৭০	থানা : দেওয়ানগঞ্জ, জেলা : জামালপুর
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	বয়স : ৭০ বছর

ওয়ালের সাথে শুয়ে থাকেন

হানাদার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া, মানুষ হত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ থানাধীন জিলবাংলা চিনিকলের উত্তর পার্শ্বে চর ভবসুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিলিশিয়া বাহিনী ক্যাম্প করে। সেখানে তারা অনেক বাংকার খনন করে। আমি তখন ওই চিনি কলের একজন চাকরিজীবী। হানাদার বাহিনী আমাদের রাত ১১টা হতে সকাল ৬টা পর্যন্ত রেললাইন পাহারার নির্দেশ দেয়। আমাদের নিয়ে ১৮ জনের এক একটি গ্রুপ গঠন করে, প্রত্যেকের হাতে দেয়া হয় গুলি ছাড়া দোনালা বন্দুক। নির্দেশ দেয়া হয় যাতে কেউ রেললাইন উঠাতে এবং মিল ধ্বংস করতে না পারে সেজন্য সজাগ থাকতে। ক্যাম্পের সম্মুখ হতে ভাটিপাড়া রেল ব্রিজ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী যাতে ক্ষতি করতে না পারে তাও দেখার দায়িত্ব দেয়া হয়। মিল কলোনিতে একজন পশ্চিমা দারোগা সদা সর্বদাই তদারকি করার জন্য নিয়োজিত হয়।
একদিন রাত দুইটায় মুক্তিবাহিনী এসে আমাদেরকে সরে যেতে বলে এবং নির্দেশ দেয়, মিল কলোনিতে ওয়ালের সাথে শুয়ে থাকেন। আমরা যার যার মতো শুয়ে পড়ি। তখন মুক্তিবাহিনী গুলিবর্ষণ করতে থাকে এবং ক্যাম্পের লোকজন সবাই বাংকারের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তদারকিতে থাকা দারোগা কলোনির ময়লা নিষ্কাশন ড্রেনের মধ্যে শুয়ে পড়ে। পরদিন শুক্রবার জুমার পর মিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ভাটিপাড়া নামে একটি গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়, একজন লোক গুলিতে মারা যায় এবং একজন আহত হয়।
এভাবে যুদ্ধে বহু মানুষ মারা যায়। যুদ্ধকালীন অমানুষিক জীবনযাপন করতে বাধ্য হই। এইভাবে ৯ মাস কেটে যায়, দেশ স্বাধীন হয়। গড়ে উঠে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ।

সূত্র: জ-১৯৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকরী

শারমিন নাহার (শাপলা)	**ওয়াজেদ আলী (খোকা)**
জিল বাংলা সুগার মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	থানা : দেওয়ানগঞ্জ, জেলা : জামালপুর
৭ম শ্রেণি, রোল : ৪৩	বয়স: ৫৩ বছর

এমনেইতো বেঁচে থাকতে পারবো

আমার বয়স তখন পাঁচ-ছয় বছর। থাকতাম ময়মনসিংহে। ২৫ মার্চের পর থেকে শহরে প্রায় প্রতিদিনই কারফিউ জারি করা হতো। রাতে আমরা সকলেই এক ঘরে বসে হারিকেন জ্বালিয়ে রেডিও শুনতাম। বাইরে থেকে কোনো শব্দ শুনলে বা কেউ যদি বাবার নাম ধরে ডাক দিত তাহলে আমাদের আত্মায় আর পানি থাকত না। শুধু মনে হতো এই বুঝি মিলিটারি এসেছে। ১৫ এপ্রিল সকাল ১০টার দিকে আমার ছোট কাকা এসে বাবাকে বলেন, এই শহরে আর না। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। বাবা ও কাকার কথামতো আমরা যার যার প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে নিলাম। মা কিন্তু কোথাও যেতে চাইছিলেন না। কারণ তার দীর্ঘ দিনের সংসার, এতো জিনিসপত্র রেখে কোথায় যাবেন? বাবা মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, বেঁচে থাকলে আবার সব হবে।

পরদিন ভোরবেলা আমরা ময়মনসিংহ শহরের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লাম। লক্ষ্য একটাই, বাঁচতে হবে। বাসে করে আমরা আসলাম হালুয়াঘাট। মার দূর সম্পর্কীয় এক মামার বাড়িতে। সেখানে কিছু দিন থাকার পর শুনতে পেলাম হালুয়াঘাট বাজারে নাকি মিলিটারি এসেছে। তাই আমরা সেখান থেকে চলে গেলাম পুরাকান্দুয়া নামক এক নিভৃত গ্রামে। সেখান থেকে ভারতীয় বর্ডার খুবই কাছে। কিন্তু সেখানে হলো একটা সমস্যা। সেই গ্রামের মাতব্বর কিছুতেই তার গাঁয়ের লোকদের কোথাও যেতে দিবে না। এদিকে গ্রামটিতে শরণার্থীতে ভরে গেছে। খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব দেখা দিল। কত লোক যে সে সময় নিজের চোখে মরতে দেখেছি তার কোনো হিসাব নেই। অবশেষে আমার বাবা এবং শহরের কিছু লোক মিলে সেই মাতব্বরকে রাজি করালেন। ৭ মে আমরা রওয়ানা দিলাম ভারতীয় বর্ডারের দিকে। যার যতটুকু সম্বল ছিল সে তাই নিয়ে রওয়ানা দিল।

রাস্তায় কিছু গ্রাম্য ডাকাত শরণার্থীদের জিনিসপত্র লুট করতে শুরু করল। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার একটা ছোট রেডিও ছিল। সেটা আমি রেখেছিলাম আমার মায়ের অলংকারের বাক্সের মধ্যে। ডাকাতরা যখন মার অলংকারের বাক্সটি ছিনিয়ে নিচ্ছিল তখন আমি চিৎকার দিয়ে বলেছিলাম, মা আমার রেডিও! তখন ডাকাতদের একজন রেডিওটি আমাকে ফেরত দিয়ে বলেছিল 'আম্মা এই লন আপনের খেলনা।'

এভাবে অনেক কষ্ট করে আমরা বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করলাম। ভারত সীমানায় পৌঁছে দেখি করুণ দৃশ্য। শুধু মানুষ আর মানুষ। আমার বড় মামা ছিলেন ভারতীয় ডাক্তার। খবর পেয়ে আমাদের সেখান থেকে নিয়ে গেলেন জলপাইগুড়িতে। সেখানে পৌঁছে বাবা একটি কথা বলেছিলেন, যেটি এখনো আমার কানে ভাসে– 'আহ, এখানে তো তাও বেঁচে থাকতে পারব।'

সূত্র: জ-৩৮০৫

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
শাপলা বণিক	**বেলা বণিক**
সরকারি জাহেদা সাফির মহিলা কলেজ	
একাদশ শ্রেণি, রোল : ২৩	

দেশে ফিরে আসার সাহস পায়নি

আমি এই ঘটনাটা যার মুখ থেকে শুনেছি তিনি সর্ম্পকে আমার পিসি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ১৪-১৫ বছর হবে। আমার দাদুর বাড়ি জামালপুর জেলার জোয়াইল গ্রামে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জন্মভূমির মায়া ছেড়ে

তিনি ভারতে চলে যেতে চাননি– গ্রামেই ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন বেশ কিছুদিন। আশেপাশের অনেক গ্রামে মিলিটারিদের দেখা গেছে। যে কোনো সময় আমাদের গ্রামে আসতে পারে। এমনই আতংকে কাটে সময়। আমার দাদু রাতে জেগে থাকেন। এ রকমই একটি রাত। বাড়ির পাশে অনেকগুলো পায়ের শব্দ একসঙ্গে ভেসে আসছে। দাদু যে ভয় পেয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি দেখলেন যে এরা পাকিস্তানি বাহিনীর কেউ না বরং আমাদের আশেপাশের গ্রামের সাহসী তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারা। কারণ গ্রামের কিছু দালালের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের থাকা সম্ভব হচ্ছে না। দিনের আলো নেভার সাথে সাথে তারা গ্রাম ছেড়ে পথে নেমেছে। সংখ্যায় তারা ১১-১২ জন হবে। তারা খুবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিল। দাদু তাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসে বসতে দিলেন।

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। দাদু এসে দিদাকে সব বলতেই তিনি উঠে ঘরে যা কিছু ছিল তাই দিয়ে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের খেতে দিলেন। খাওয়া শেষ করে দাদু-দিদার আশীর্বাদ নিয়ে তরুণ বীরেরা আবার পথে নামল। তারপর তেমন কিছুই ঘটল না। তারপরের দুই দিনও স্বাভাবিক ছিল সব কিছু। কিন্তু তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আমার দাদুর বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠল। এভাবে হঠাৎ আক্রমণের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। কারো কোনো ক্ষতি না হলেও ঘরের কোনো কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেই রাত অন্যের বাড়িতে কাটিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পরদিন ভোরে বুকে কষ্টের পাথর বেঁধে তারা রওয়ানা হয়ে যান ভারতের উদ্দেশে। সেখানে মাইনকার চর (বরগুনা) নামক একটি স্থানের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন। সেখানকার ব্যবস্থা ভালোই ছিল। পাঁচজন করে প্রতি রুমে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনীয় বাসনকোসন, রান্না করে খাওয়ার জন্য চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি যা আবশ্যকীয় জিনিস তা দেয়া হয়েছিল।

যত কিছুই থাক আমার দাদুর মন ছিল বাড়িতে। তিনি গ্রাম ছেড়েছিলেন তার পরিবার বাঁচাতে। কারণ তখন আমাদের পরিবারে দাদু ছাড়া আর কোনো পুরুষ ছিল না। আমার বাবা তখন ছোট। আর পাকিস্তানিদের আক্রোশ বাঙালিদের ওপর থাকলেও হিন্দুদের ভয় ছিল বেশি। যাই হোক এভাবে তারা যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতেই থাকলেন। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ শেষে যখন স্বাধীন হলো তখন তারা ফিরে এলেন স্বপ্নের স্বাধীন দেশে। এসেই কিন্তু বাড়ি যেতে পারলেন না। কারণ বাড়ি নামের জায়গাটির কোনো চিহ্ন ছিল না। তাই তারা সরিষাবাড়ী শরণার্থী ক্যাম্পে উঠলেন। তারপর কিছুদিন আত্মীয়দের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ঠিক করে গ্রামে ফিরে আসলেন। তারপর জানতে পারলেন মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার ঘটনা হানাদারদের বলে দিয়েছিল আমাদের গ্রামেরই এক রাজাকার। আর সে ছিল হিন্দু। স্বজাতি হয়েও রক্ষা করার বদলে সে দাদুকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। মজার ব্যাপার হলো, যুদ্ধের সময় সেই রাজাকারও নিজের প্রাণ বাঁচাতে ভারত চলে গিয়েছিল। আজ পর্যন্ত দেশে ফিরে আসার সাহস পায়নি।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পরিবারের আর কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। আজ আমার দাদুও নেই, দিদাও নেই। মারা গেছেন। বেঁচে আছেন তাদের সন্তানেরা যাদের মুখে মুক্তিযুদ্ধের এই ঘটনাগুলো আমরা শুনছি। জানতে পারছি কত ভয়াবহ ছিল সেই দিনগুলো। উপলব্ধি করতে পারছি মুক্তিযুদ্ধকে, যার জন্য এই স্বাধীন বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা।

সূত্র: জ-৩৮০৮

সংগ্রহকারী :
সুমি সাহা
সরকারি জাহেদা সাফির মহিলা কলেজ
একাদশ শ্রেণি, রোল : ৭৫

বর্ণনাকারী :
জ্যোৎস্না রানী সাহা

রক্ত দিয়ে গ্রামটিকে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে

আমরা এখনকার প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি। কিন্তু অনুধাবন করতে পারি, কী নির্মম ছিল সেই দিনগুলো। আমি এখন যে ঘটনাটি লিখব সেটা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আনিল চন্দ্র বসাকের কাছ থেকে শোনা। ঘটনাটি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার পাতরাইল গ্রামের। আমি এখন স্যারের ভাষায় ঘটনাটি বর্ণনা করব।

১৯৭১ সালের আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাস হবে। আমরা মামার বাড়িতে থাকি। ফজরের আজানের কিছু আগে মামা আমার ঘরের জানালায় জোরে জোরে আঘাত করে বলতে লাগলেন মিলিটারিরা গ্রামে ঢুকে পড়েছে এবং হত্যাকাণ্ড চালাতে। আমি ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং শুনলাম চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলাম মামা তার নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। আমিও আমার প্রাণ বাঁচাতে বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে গিয়ে দেখি পাকিস্তানিদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক মানুষ লুকিয়ে আছে। নিজেদের প্রাণটিকে হাতে নিয়ে আমরা সেখানে বসে রইলাম। মানুষের আর্তচিৎকারে এবং গুলির শব্দে আমাদের কান ফেটে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে সব আওয়াজ কমে আসতে থাকল। এভাবেই আমরা জঙ্গলের ভেতর প্রায় নয়টা পর্যন্ত বসে থাকলাম।

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হওয়াতে আমরা যারা শক্ত সামর্থ ছিলাম তারা বেরিয়ে আসলাম এবং গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আমাদের গ্রামের কালীমন্দিরের সামনে এসেই আমরা আঁতকে উঠলাম। মন্দিরের সামনে একটি লাশ পড়ে আছে এবং দেখে মনে হচ্ছে মা কালীকে উৎসর্গ করে যেমন পশু বলি দেওয়া হয় তেমনি মানুষটিকে যেন বলি দেওয়া হয়েছে। সারাটা গ্রামজুড়ে ছিল শুধু রক্ত আর লাশ। এত রক্ত দেখে মনে হচ্ছিল যেন রক্ত দিয়ে গ্রামটিকে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার শরীর শিউরে উঠছিল। সেই রাতে পাকিস্তানি মিলিটারিরা শুধু গুলি করেই মানুষ হত্যা করেনি, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অনেকের নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দিয়েছিল। চারদিকে সেসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। একই পরিবারের বিশ্বনাথ বসাক, দুলাল ও অমিত এই তিনজনকে তারা হত্যা করেছিল। আরেকজন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এক-দুই দিন পর তার লাশ কালীমন্দিরের পাশে ডোবায় ভেসে ওঠে। এভাবে সেদিন পাকিস্তানি হানদারবাহিনী পৈচাশিক তাণ্ডব চালিয়ে গ্রামের ১৪ জন মানুষকে হত্যা করেছিল।

সূত্র: জ-৬০৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
আঞ্জুমান আরা ইসলাম	**অনিল চন্দ্র বসাক**
সরকারী জাহেদা সফির মহিলা কলেজ	
একাদশ শ্রেণি, রোল : ৩৩	

সুলতান কোথায়

মুক্তিযুদ্ধের এই গল্পটি আমি চাচার মুখ থেকে শুনেছি। ১৯৭১ সাল। বাবা তখন নান্দিনা পাইলট হাই স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তার ভাবার সময় নেই। বন্ধুদের আহবানে ২-৪ দিন মিছিলে যোগদান ছাড়া রাজনীতির সাথে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন না। ২৫ মার্চের কালোরাতে গনহত্যা শুরু হল। আমাদের নির্ধারিত পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল, জানানো হল, সেটা পরে অনুষ্ঠিত হবে। আমার চাচা তার কয়েকজন বন্ধু মিলে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য নদী পাড়ি দিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণে তার যাওয়া হলো না। আমার দাদার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি সরকারি চাকরি করতেন। কিছুদিনের মধ্যে নির্দেশ এল যে, যাদের সন্তান পরীক্ষার্থী অবশ্যই তাদের পরীক্ষা দিতে হবে। অবশেষে দাদার চাকরির কথা তথা জীবনের কথা ভেবে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। শেষ পরীক্ষাটি ৫০ নম্বরের বিষয়টি ছিল, 'পাকিস্তান দেশ ও সৃষ্টি।'

ইতিমধ্যে সারা দেশে রাজাকার-আলবদরদের দাপট বেড়ে গেছে। স্কুল হোস্টেল এলাকায় ছিল রাজাকারদের সবচেয়ে বড় ক্যাম্প । পরীক্ষা শেষে বাবা ও তার দুই বন্ধু হোস্টেলের সম্মুখ দিয়ে আসার সময় পাকিস্তান দেশ ও সৃষ্টি বইটির "ভূমিকা" শীর্ষক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বড় বড় করে তারা বলছিলেন, "বাংলাদেশ" একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ধমক দিয়ে থামতে বলাতে তিন বন্ধু থেমে যান এবং বুঝতে পারেন মহাবিপদে পড়েছেন। রাজাকাররা তাদের ধরে নিয়ে বাবা যে কক্ষে থাকতেন সেখানটায় তারা গেল। কক্ষে প্রবেশ করে তিন বন্ধুই অবাক এবং ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলেন। রাজাকার কমান্ডার তার বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তাকে না চেনার ভান করে হুকুম দিলেন পিঠমোড়া করে বেঁধে জামালপুর আর্মি ক্যাম্পে পাঠানোর জন্য। এ খবর চাচার প্রিয় শিক্ষক হোস্টেল সুপারের কানে পৌঁছে। ওই সময়ে জামালপুর জেলার শান্তি কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন হোস্টেল সুপার। পাক আর্মিদের সাথে তার ছিল ওঠাবসা। তিনি তাড়াতাড়ি চাচা ও তার বন্ধুদের ছেড়ে দিতে বললেন। এই কারণে কমান্ডার রাগে গরগর করতে লাগলেন এবং চাচার গালে কষে এক চড় মারলেন। যা বাবাকে আজও পীড়া দেয় অবশ্য তারা বাবাকে সেদিন ছেড়ে দিয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে ৪-৫ মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। রাজাকার-আলবদরদের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। বহু শরণার্থী আমার দাদার গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিল। চাচার সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন যোগাযোগ ছিল। চাচার মুখে শুনেছি তিনি চাল, ডাল ও টাকা-পয়সা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। এ ধরনের কর্মকাণ্ড দ্বারা তিনি সার্বিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দিয়েছেন।

যে মুহূর্তে জামালপুর পাকহানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হয়, চাচা তখন ভাত খাচ্ছিলেন, সবকিছু ফেলে তিনি নান্দিনা স্কুলের দিকে দৌঁড়াতে লাগলেন। আমার চাচা বাস করতেন নান্দিনার একটি বাড়িতে। লাশের পর লাশ তিনি দেখতে পেলেন। সকলেই বীভৎস কাণ্ড দেখছে আর সকলের মুখেই একই কথা, সুলতান কোথায়? তাকে পেলে চিবিয়ে খাবো। কারণ সুলতান ছিল রাজাকার কমান্ডার। চাচার মুখেও একই কথা, অত্যাচারী সুলতান কোথায়? কারণ সুলতান তার গালে কষে এক চড় মেরেছিলো। কিন্তু কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। চাচা এখনো তাকে খুঁজে বেড়ান। আমার চাচার পুরো নাম মো. বজলুর রহমান। তিনি বর্তমানে একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি আপনি সুলতানকে সামনে পেলে কী করবেন? তিনি বলেন, আমি তাকে কবরের মধ্যে পেলেও তার কবরের ওপর লাঠিপেটা করবো। কারণ আমার গালে হাত পড়লে শুধু তার কথাই মনে হয়।

সূত্র: জ-১০৮৬

সংগ্রহকারী :
জান্নাতুল ফেরদৌস (বিথী)
সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ
একাদশ শ্রেণি, রোল : ৪৮

বর্ণনাকারী :
মো. বজলুর রহমান

মুক্তিযোদ্ধা কিয়া চিজ হায়

আমি একদিন তথ্য প্রদানকারী জেঠা মিয়া, সাবেক চেয়ারম্যান ও সহকারী মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারকে বললাম, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত একটি স্মরণীয় ঘটনা আমাকে বলেন, তা লিখে আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আজিজুর রহমান স্যারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেব। জেঠা মিয়া বলতে শুরু করলেন, ১৯৭১ সালে ১৫ মে ভারতে গিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি। আমি এবং আমার সাথী মুক্তিযোদ্ধারা ১১নং সেক্টরের জামালপুর জেলাধীন বক্সিগঞ্জ উপজেলার ধানুয়া-কামালপুর নামক স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করি। পাকবাহিনী যাতে কামালপুরের পশ্চিমাংশে না আসতে পারে সেভাবে পজিশন নিয়ে থাকি। আমি বদিউজ্জামান কোম্পানির টুআইসি পদে দায়িত্বে ছিলাম। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পাকহানাদার বাহিনীর সাথে সারারাত্রি সম্মুখ যুদ্ধ করি। পরে আমাদের পুরো কোম্পানি

পিছু হটে যাওয়ার সময় পাকহানদার বাহিনী আমাকে ঘেরাও করে। আমি নিরুপায় হয়ে পাশের ইক্ষুক্ষেতে আত্মরক্ষার জন্য ঢুকে পড়ি। কয়েকটি ইক্ষু মাটিতে গাদা করা ছিল, তার নিচে আত্মগোপন করি । মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিজের গলার চামড়া ছিড়ে ফেলি। পাক বাহিনী ইক্ষুক্ষেত ঘিরে ফেলে এবং আমাকে খুঁজতে থাকে। আমাকে না পেয়ে দুই-একজন পাকহানাদার বলতে থাকে, 'মুক্তিযোদ্ধা কিয়া চিজ হায়'? আর একজন বলে, মুক্তিবাহিনী পক্ষি হইয়া উড়াল দিয়া যায়। এই কথা বলতে বলতে তারা স্লোগান দেয়– ইয়ালি, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ মুর্দাবাদ।

তারা চলে যাওয়ার পর আনুমানিক ভোর চারটায় আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি । বিকাল চারটায় আমার জ্ঞান ফিরে আসলে আমি মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে গিয়ে মেজর আবু তাহের এবং ক্যাপ্টেন মান্নানের নিকট সারারাত্রি ও সকালে যুদ্ধের ঘটনা বলি। পরদিন সকাল আটটায় ১২০০ মুক্তিযোদ্ধাকে ফলইন করিয়ে তাদের সামনে একটি টেবিলে দাঁড় করায়। আমাকে দিয়ে পাকবাহিনীর সাথে যুদ্ধের বর্ণনা করায়। তারপর আমার সাহসিকতার পরিচয়ে খুশি হয়ে আমার নামে একটি এসএমজি ইস্যু করে দেন। যা আমি দেশ স্বাধীন হলে সরকারের কাছে দেই। সেই হাতিয়ার দিয়ে সহযোদ্ধাদের সাথে ধানুয়া-কামালপুর, শেরপুর প্রভৃতি জায়গায় যুদ্ধ করি।

সূত্র: জ-১২৩৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
নসিবুল হক	**শেখ আব্দুল মালেক**
ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয়	
৯ম শ্রেণী, রোল : ১৫	

দিনে রাজাকার রাতে মুক্তিযোদ্ধা

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী থানার রুদ্রবয়ড়া গ্রামে আমার দাদার বাড়ি । বয়ড়া স্টেশনের উত্তর পাশে। বাড়ির পাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে। অদূরে একটি রেলওয়ে ব্রিজ ছিল। সেই ব্রিজের পূর্ব পাশে রেলওয়ের জায়গায় পাকিস্তানিরা ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়েছিল। গ্রামবাসীর মনে এর ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল, কখন কাকে মেরে ফেলে এই ভেবে। কেউ কেউ ঘরের ভেতরে মাটিতে গর্ত করে রাত কাটাত। এক একটি রাত ছিল ভয়ংকর কালোরাত।

আমার দাদাও ঘরের ভেতর মাটিতে গর্ত করে তার ওপরে টিন, মাটি ও খড় দিয়ে লুকানোর জায়গা করেছিলেন। পরিবারের সবাই গোলাগুলির সময় সেখানে আশ্রয় নিত। এক রাতে মুক্তিবাহিনী বাড়ির পেছনের জঙ্গলে অবস্থান নিয়ে ডিনামাইট ফিট করে ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়। ব্রিজের কালভার্ট ও অন্যান্য লোহার টুকরা ইত্যাদি আমার দাদার ঘরের চালে প্রচণ্ড শব্দ করে পড়তে থাকে। চার-পাঁচজন রাজাকারও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে মারা যায়। সকাল হতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। গরু-ছাগল ইত্যাদি ক্যাম্পে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে জবাই করে খায়। মুক্তিবাহিনী ও নিরীহ মানুষদের ধরে নিয়ে মেরে ফেলতে থাকে। এই ভয়ে সকল গ্রামবাসী ঘরবাড়ি ফেলে দূরে আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে যায়। ঘরবাড়ির মায়া-মমতায় কেউ কেউ গোপনে দেখতে আসে, কিন্তু যারা আসে তারা আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারেননি।

একদিন আমার বাবাও গ্রামের অবস্থা দেখতে এসে ধরা পড়েছিলেন পাকহানাদার বাহিনীর হাতে। তাকে ধরে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। আমার বাবাতো মনে মনে ভাবল এই বুঝি তার জীবনের শেষ দিন। ভাগ্যবশত সেদিন পাশের গ্রামের মুখোশধারী রাজাকারদের লিডার চান মিয়া ওখানে ছিল। তিনি রাতে মুক্তিবাহিনীর হয়ে কাজ করতেন। সকল গোপন খবর পৌঁছাতেন। ওই দিন চান মিয়া আমার বাবাকে দেখে বলেছিলেন, 'তোরা একে

কেন ধরে এনেছিস? যেখান থেকে ধরে এসেছিস সেখানে রেখে আয়, ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়'। সেদিন উদ্ধার পেয়ে আমার বাবা এখনও বেঁচে আছেন।

আমার দাদা একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি সরিষাবাড়ীর কর্মস্থল থেকে আসার সময় প্রচণ্ড গোলাগুলি আরম্ভ হয়। শব্দ শুনে তিনি জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে পড়েন। এমন সময় একটি গুলি তার ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে যায়। আরেকটি গুলি তার পেটে আঁচড় কেটে গিয়েছিল। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি বেঁচে যান। এভাবে পাকিস্তানি হানাদাররা গ্রামের অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল।

দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। তখন আমার দাদা, বাবা ও গ্রামের অন্যান্য লোকজন আত্মসমর্পণকারী রাজাকার ও পাক হানাদারবাহিনীকে দেখতে যান। সে সময় মুক্তিবাহিনীর একজন দলনেতা মোফাজ্জল হোসেন গামা সেই চান মিয়াকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন। যা আমার বাবা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং আমার বাবা সেই দিনই জেনেছিলেন চাঁন মিয়া ছিলেন দিনে মুখোশধারী রাজাকার এবং রাতে মুক্তিযোদ্ধা।

সূত্রঃ জ-৩৩৮

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
তাজনুবা-ই-জান্নাত	**মো. রফিকুল ইসলাম তালুকদার**
জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	মহলা : পশ্চিম ফুলবাড়িয়া, থানা : জামালপুর
নবম শ্রেণি, বিজ্ঞান, প্রভাতী শাখা	জেলা : জামালপুর
	বয়স : ৪৫ বছর

তখন কি সাহসই না ছিল

গল্প নয়, এগুলো ১৯৭১ সালের সত্যি ঘটনা। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। আমরা যারা মাঠের যোদ্ধা ছিলাম তাদের কথা তো বলে শেষ করার নয়।

প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপ্রেরণায় বাঙালি জাতি দেশ মুক্ত করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মধ্যে আমিও একজন। তখন আমার বয়স ১৪ বছর। আমার মা-বাবা, চাচা-চাচি আলবদর ও রাজাকার দ্বারা অত্যাচারিত হয়। বুটের লাথি, রাইফেলের বাঁটের আঘাত, স্বর্ণ অলংকার ডাকাতি, আমার চোখের সামনে ঘটে। তার পরের দিন আমি, আমার বড় ভাই মমতাজ উদ্দিন ও চাচাতো ভাই রিয়াজ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সামান্য অর্থ যে যা পেয়েছি তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা ৭টায় রওনা হই এবং মাদারগঞ্জ থানার অন্তর্গত শ্যামগঞ্জ কালীবাড়ি নৌকার ঘাটে হাজির হই, সেটা ছিল আগস্ট মাসে।

ওই ঘাট থেকে লোকদেরকে নিয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী জনপথে পৌঁছে দেয়া হতো। রাত ৯টায় ১৫-২০ জন যুবক নিয়ে মাঝি গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলো। মাঝি-মাল্লারা পাল তুলে অনেক নৌকা নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। বাহাদুরাবাদ ও ধানুয়া-কামালপুরের পাক আর্মি, আলবদর ও রাজাকাররা স্পিড বোট, ট্রলার ও লঞ্চ নিয়ে নদীতে টহল দিচ্ছে। যেখানে বা যে নৌকাকে সন্দেহ হত সাথে সাথে মর্টার শেল মেরে লোকসহ পানিতে ডুবিয়ে দিত বা ধরে নিয়ে যেত। ২-৩টি নৌকা চোখের সামনে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। আমরা অনেকেই অন্যান্য নৌকায় ২-১ জন করে লুকিয়ে রইলাম। ভয় ও আতংকের মধ্য দিয়ে অনেক ঘটনার পর সকাল ৯টায় আমাদেরকে মেঘালয় রাজ্যের সীমান্ত জনপদে পৌঁছে দিল। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করে রাজ্যের ভেতরের দিকে জনপদে রওনা হলাম। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পাথর ও মাটি কেটে রাস্তা তৈরি হয়েছে। এই দৃশ্যগুলো আমার জীবনে সর্বপ্রথম অবলোকন করলাম। আমি অবাক হতাম এই সব দৃশ্য দেখে। অনেক ঘটনা যা ছোট পরিসরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা কালাইপাড়া হয়ে পাতিজোড়া শরণার্থী শিবিরে হাজির হই। লক্ষ

লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ। কলেরা-ডায়রিয়ায় আক্রান্ত নরনারী-শিশুর মৃত্যু হচ্ছে প্রতিনিয়ত। জীবনকে মনে হতো তখন পুতুল খেলা।

যা হোক, ২১ দিন ট্রেনিং শেষে আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে হাজির হই। তখন কর্নেল তাহের শেলের আঘাতে আহত অবস্থায় ছিলেন। আমরা সব সময় গেরিলা যুদ্ধের জন্য অ্যালার্ট থাকতাম। একদিন হঠাৎ রাত ১০টায় বাঁশি বাজিয়ে আমাদের হাজির করা হলো এবং এই মর্মে আদেশ জারি করা হলো যে, এখুনি ধানুয়া-কামালপুর যুদ্ধের জন্য রওনা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একদল ইন্ডিয়ান আর্মিসহ আমরা ২০ জন রওনা হলাম। কনকনে শীত, টিপ টিপ বৃষ্টি, কাদামাখা রাস্তাঘাট আর খাল-বিল পানি দিয়ে মাছদরোগা হয়ে ভোর ৪টায় জনমানবহীন বিরাট এক বসত বাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করার জন্য তাঁবু ফেললাম। পথিমধ্যে এলোপাথাড়ি ঠুসঠাস গুলির আওয়াজ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। তাবু ফেলার পর চা-নাশতা মুখে দিতে না দিতেই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মতো বিদ্যুৎ চমকানো মেঘের তর্জন-গর্জন শুরু হলো গোলাগুলি। চারদিক অমাবস্যার রাতের মতো অন্ধকার হয়ে গেল। আমরা সেই অবস্থায় গেরিলা পজিশনে চলে গেলাম। পাক আর্মি আমাদের উপস্থিতি সন্দেহে তুমুল গোলাগুলি করছিল।

সেই দিন আমেরিকার সপ্তম নৌবহর আগমনের ইংঙ্গিত পাওয়া গেল। তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১০ জন যমুনা নদীর তীরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল। পথের মধ্যে আমরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হই। তিন তিনটি গুলি আমার কানকে স্পর্শ করে শোঁ শোঁ শব্দে সামনের দিক থেকে পেছনের দিকে চলে গেল। যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাক করে ক্যাম্পে ফিরে আসি। সেন্ট্রিতে থাকা অবস্থায় ৪ জন আলবদর-রাজাকারকে আটক করি এবং তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য বের করি। যে তথ্যের ওপর আমরা পরে বেঁচে গেছি। কয়েক দিন পর সদলবলে ক্যাম্প ত্যাগ করে আমরা জামিরের চরে রাতে এসে হাজির হই। সেখানে এক স্কুলে রাত কাটাই এবং পরের দিন সকালে শ্যামগঞ্জ কালীবাড়ি হয়ে সরিষাবাড়ীর অন্তর্গত ভাটারা ইউনিয়নে হাজির হই। শেষ বেলায় যৌথবাহিনীর সাথে বাউসী ব্রিজ ও অন্যান্য জায়গায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তখন কি সাহসই না ছিল আমাদের বুকে!

দুঃখের কথা বলতে লজ্জা নেই, একরাতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য জঙ্গলের ভেতর শুয়ে পড়ি। ভীষণ শীত। বালিশ রূপে ব্যবহার করার জন্য ডাল-পালা পাতা আবর্জনা মাথার নিচে রেখে দিলাম। হাত-পা মাথা জামা কাপড় দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে পড়লাম। পরে দেখা গেল ডালপালা ও আবর্জনায় মানুষের কাঁচা মল।

থাক, ১৯৭১-কে আর বাড়াতে চাই না। সময়মতো এ নিয়ে আরো লিখব। অনেক মুক্তিযোদ্ধাই আজ বেঁচে নেই ঠিক, কিন্তু তাদের অত্মত্যাগের ইতিহাস রয়ে গেছে। এদেশে যারা আছেন এবং যারা আসবেন তাদের সবাইকে এই সুন্দর ইতিহাস শিক্ষা দিয়ে সুন্দর দেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে শেষ করলাম।

সূত্র: জ-২৫৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. শাহিন মিঞা	**আ. কুদ্দুস তালুকদার (মুক্তিযোদ্ধা)**
জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : ভাটারা, জামালপুর
৯ম শ্রেণি	সম্পর্ক : কাকা

খিচুড়ির ভেতর পোকা থাকত

আমি মো. নাজিম উদ্দিন একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ সালে মাতৃভূমি রক্ষার জন্য মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তখন একশ্রেণির বান্দা স্বাধীনতার বিরোধিতা করে। এরা রাজাকার-আলবদর নামে পরিচিত। রাজাকার-আলবদররা গ্রামের যুবকদের যাকেই পেত তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলত। এ অবস্থা যখন চরম

আকার ধারণ করল তখন কোনো উপায় না দেখে আমরা দশ-পনেরো জন যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতে চলে যাই।

ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জে আমি এক মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। সেখান থেকে চলে যাই মেঘালয় রাজ্যের ঢালু ক্যাম্পে। খাবার-দাবারের খুব কষ্ট ছিল সেখানে । তিন দিন শুধু কলা খেয়ে জীবন বাঁচাই। পরে হেলিকপ্টার যোগে আমাদের রেশনের চাল সরবরাহ করা হয়। সেই চাল দিয়ে আমরা খিচুড়ি রান্না করে খেতাম। খিচুড়ির ভেতর এক শ্রেণির পোকা থাকতো এবং তা দেখে আমাদের কান্না আসতো। এরপর পোকা বেছে ফেলে দিয়ে তাই দিয়ে ক্ষুধার জ্বালা মেটাতাম। আমরা উপজাতিদের সাহায্য নিই। তারা রেশনের চালের পরিবর্তে পাহাড়ের কলা, কাঁঠাল, চিড়া এগুলো দিয়ে আমাদের সাহায্য করতো।

আমরা আগস্ট মাসে যুদ্ধের জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করি এবং গেরিলা যুদ্ধ শুরু করি। অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ গোপন সূত্রে সংবাদ পাই যে, পাকবাহিনী আলবদর-রাজাকারদল নিয়ে শেরপুর জেলার চন্দ্রঘোনা বাজার আক্রমণ এবং আগুন দিয়ে সব পুড়িয়ে দেবে। আমরা তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে নকলা থানার দক্ষিণে কায়দা গ্রাম পর্যন্ত এগিয়ে যাই এবং রাস্তার ধারে ওঁৎ পেতে থাকি। ভোর ৫টার সময় পাশের বাড়ির এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করি যে, আশপাশে কোনো পাকবাহিনী ও আলবদর-রাজাকার আছে কিনা। মহিলা বলে, আমি মুসলমান, মিথ্যা বলব না, আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করি। তার কথায় আমরা উৎসাহিত বোধ করলাম। কিন্তু এর পরপরই পাকবাহিনী রাজাকারসহ পেছন থেকে আমাদেরকে আক্রমণ করে। সেখানে আমাদের সাথে তাদের ৬ ঘণ্টা প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে আমাদের ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারায়। আমার এক ভাই আমার সামনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। আমি তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে বাঁ পায়ের উরুতে গুলিবিদ্ধ হই। আমাকে গ্রামের ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি সুস্থ হয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসি।

আমরা কাজাইকাটা গ্রামে হাইড-আউট করি। গোপন সূত্রে সংবাদ পাই, রাজাকাররা যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে দেয়। সেই সংবাদ পেয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে ইটাইল বাজারে পাকবাহিনী মারার জন্য প্রস্তুতি নিই। হঠাৎ করে আমাকে এক রাজাকার চিনে ফেলায় কোনো উপায় না দেখে একটি বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের শাড়ি পরে পানির কলসি নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিই। আমার ওপর তুমুল গুলি হতে থাকে। আমি নদীতে সাঁতরাতে থাকি। পরে আমি আল্লাহর রহমতে উদ্ধার পাই। পরদিন সেই রাজাকারকে হানা দিয়ে ধরে ফেলি এবং গুলি করে মেরে ফেলি।

৯ নভেম্বর পিয়ারপুর স্টেশনের রেললাইন দিয়ে দুইজন পাঞ্জাবি সেনা ভোরবেলা জামালপুর থেকে ময়মনসিংহ যাচ্ছিল। পথে কয়েকজন লোক দেখে ফেলে এবং আমাদেরকে সংবাদ দেয়। আমরা সাথে সাথে তাদের ঘিরে ফেলি। তাদের সাথে তিন ঘণ্টা গোলাগুলি হয়। তাদেরকে আমরা মারতে সফল হই।

১৬ নভেম্বর নকলা থানার এক হিন্দু বাড়ি থেকে তিনজন যুবতী মহিলাকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। আমরা গোপন সংবাদ পেয়ে তাদের ক্যাম্প ঘিরে ফেলি। সেখানে প্রায় চার ঘণ্টা গোলাগুলি হয়। পরে আমরা তাদেরকে সারেন্ডার করতে বাধ্য করি। সেই মুহূর্তে পাঞ্জাবিদের নির্যাতনে এক মহিলার মৃত্যু হয়। বাকি দুইজনকে উদ্ধার করি। সারেন্ডারের পর তাদেরকে বেঁধে এক বিলের পাড়ে নিয়ে যাই। কোম্পানি কমান্ডার আমাকে বললেন, ওদের গুলি করে মেরে ফেল। আমি তখন সেই নারী নির্যাতন এবং একজনের মৃত্যুর কথা মনে করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদের সকলকে গুলি করে খতম করি। আমরা ভারত থেকে প্রথমে ৯৫ জন মুক্তিযোদ্ধা এক কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। বিভিন্ন রণাঙ্গনে সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের মোট ১৯ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারায়।

যুদ্ধের সময়কাল বাস্তবে না দেখলে ভাষায় প্রকাশ। স্বাধীনতাযুদ্ধে কত মায়ের বুক খালি হয়েছে এবং মা-বোন ইজ্জত হারিয়েছে, আজ তাদের ইতিহাস লিখে শেষ করা যাবে না। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন তাদের কথা আমরা স্মরণ রাখব।

সংগ্রহকারী :
এলমা সিদ্দিকা
জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়
৫ম শ্রেণি

বর্ণনাকারী :
মো. নাজিম উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা
জামালপুর

মেজর তাহের পা হারালেন

আমার বয়স তখন ২৩। কয়েকজন বন্ধু মিলে গ্রামের দক্ষিণে আমরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলছিলাম। সেই সময়ে হঠাৎ করে দক্ষিণে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দ কোথায় হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমরা যাই এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসি । বিকেলের দিকে কাঁঠাল গাছের নিচে বসে আমরা কথাবার্তা বলছিলাম। তখন আবার প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা দেখতে পেলাম রাস্তা ধারে পাঞ্জাবিরা গাড়িতে করে আসছে। সে সময় মোল্লাপাড়ার একজন মাঝবয়সী লোক সাইকেলে বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে আসছিল। তাদের গাড়ির সামনে বাংলাদেশের পতাকাসহ আসতে দেখে তাকে পাঞ্জাবিরা গুলি করে মেরে ফেলে। আমি এবং আমার সহপাঠী বন্ধুরা তাড়াতাড়ি করে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। বাড়িতে এসে সবাইকে বলি, তোমরা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। পাকবাহিনী এসে পড়েছে। তারা সবাইকে মেরে ফেলবে। বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। তোমরা তাড়াতাড়ি পালাও। আমরা বন্ধুরা মিলে তখন সিদ্ধান্ত নিলাম ভারতে পালিয়ে গিয়ে ট্রেনিং নেব, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করব।

আমি এবং আমার এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে রাতের অন্ধকারে ভারতের দিকে রওয়ানা দিলাম। সারারাত হেটে ঝিনাই নদীর পাশ দিয়ে আমরা বাংলাদেশের সীমান্তের ক্রস করে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ থানায় এসে পৌঁছলাম। জামালপুরের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এমপি হাকিম সাহেব আমাদের মহেন্দ্রগঞ্জ থানার পাশের গ্রামের গাও বুড়োর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমরা ছিলাম খুব ক্ষুধার্ত, তিনি রাতে ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করলে আমরা খেলাম। পরদিন সকালে এমপি হাকিম সাহেব বললেন, তোমাদের শরণার্থী কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। সেই মোতাবেক আমি এবং অন্যান্যরা মহেন্দ্রগঞ্জ থানায় আসি। সেখানে সকলের নাম তালিকাভুক্ত করি। তারপর আমাদের একশ কার্ড দেওয়া হয়। চাল, ডাল, শুকনো মরিচ সংগ্রহ করার পরে খাদ্যের গুণাগুণ দেখে আমার কিছু সহপাঠী বলল যে, এই খাবার খেয়ে এখানে থাকা সম্ভব নয়। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে ইশারা দিয়ে বাংলাদেশে চলে যায়। আমি এবং বন্ধু মো. সোহরাব আকন্দ (মান্নান) দুইজন এই মর্মে পণ করলাম যে, আমরা মুক্তিযোদ্ধা হব। আমরা দেশ স্বাধীন করব। দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যাব না। মরতে হয় দেশের জন্য যুদ্ধ করে মরব।

এরপর মাইকে ঘোষনা দেওয়া হলো যে, যারা মুক্তিযোদ্ধা হতে ইচ্ছুক, তাদেরকে আগামীকাল ১০টার সময় বিসিএফ ক্যাম্পে হাজির হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। এ ঘোষণা শোনার পর আমার মনে আনন্দের জোয়ার আসল। পরদিন সকালে আমরা বিএসএফ ক্যাম্পে হাজির হলাম। জামালপুরের অনেক যুবক সেখানে হাজির হলো। বিএসএফ ক্যাম্পের অধিনায়ক নিয়োগী সাহেব এবং একজন সিনিয়র অফিসার নাম তালিকাভুক্ত করল। আরও দশজনের মতো আমিও মুক্তিযুদ্ধের জন্য সিলেকশন হলাম। তারপর আমাদের নতুন ক্যাম্পে স্থান দেওয়া হলো। আমরা সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করলাম এবং তাঁবু টানালাম। থাকা খাওয়া-দাওয়ার এতই কষ্ট যে বলে বুঝাতে পারব না। তারপর আমাদের যুদ্ধের ট্রেনিং হয়েছে। এই ট্রেনিং শুরু হওয়ার খবরে তখন পাঞ্জাবিরা জামালপুরে অবস্থান নেয়। এরপর তারা আস্তে আস্তে শেরপুর ও বকশিগঞ্জে অবস্থান নিল। মাঝে মধ্যে আমরা ছোটখাটো অপারেশনের জন্য বকশিগঞ্জ ও শেরপুরে অবস্থান করতাম। তারপর ভারতের মেঘালয় প্রদেশে তুরা

ট্রেনিং সেন্টারে ২৯ দিন উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণ করি। সেখানে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং নিই। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের কানাইপাড়া নামের এক স্থানে। কয়েকদিন থাকার পর হঠাৎ শুনতে পেলাম মেজর জিয়াউর রহমান এই স্থান পরিদর্শন করতে আসবেন। সেই মোতাবেক তিনি এখানে আসলেন। তারপর সকলের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ভাইয়েরা তোমরা ধৈর্য ধর। আল্লাহর রহমতে আমরা দেশ স্বাধীন করব। তোমরা এই মনোভাব নিয়ে যুদ্ধ করবে। এই স্বাধীনতার জন্য আমাদের জীবন দিয়ে দেব, কিন্তু পিছিয়ে আসব না। যতই রক্ত ঝরুক, আমরা যুদ্ধ করতে থাকব। এই সব উদ্দীপ্তময় কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

কয়েক দিন পর আদেশ হল, তোমরা পুনর্বার মহেন্দ্রগঞ্জ থানায় চলে যাও। সেই মোতাবেক আমরা সেখানে চলে আসলাম। আমরা জানলাম যে, পাকবাহিনী বকশিগঞ্জ, ধানুয়া-কামালপুর দখল করে নিয়েছে। মহেন্দ্রগঞ্জ গিয়ে আমরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করি। আমাদের বড় অফিসাররা পরিকল্পনা করল যে, আজকের রাতে ধানুয়া-কামালপুর দখল করব। এরপর আমাদের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং ভারতীয় অধিনায়ক নিয়োগী এবং অন্যরা ব্রিফিং দিলেন যে, আগামীকাল ধানুয়া-কামালপুর মুক্ত করে আমরা সেখানে অবস্থান করব। তখন আমরা আলাহর নাম স্মরণ করে যুদ্ধে নামলাম। তখন রাত দশটা বাজে। আমরা ভোরে ভারতীয় স্টেশনে পৌঁছলাম এবং অপেক্ষায় থাকলাম যে, কখন আমাদের ওপর হুকুম আসবে পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ করার জন্য। এরপর মধ্যরাতের পর নির্দেশ আসল, পাঞ্জাবিদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হও। তখন আমাদের সাথে পাঞ্জাবিদের তুমুল যুদ্ধ হলো। পাকবাহিনীর অনেকে মারা গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার কয়েকজন মারা গেল। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন সাহেব পাঞ্জাবিদের বাংকারে একের পর এক গ্রেনেড মারা শুরু করল। হঠাৎ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের পায়ের সামনে একটি বোমা এসে পড়ল। কয়েক সেকেন্ড পর বোমাটি ফুটে গেল এবং ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের শরীরের মাংস-হাড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিনের মতো আরও কয়েকজন শহীদ হলো। পাঞ্জাবিরা সরে গেল ক্যাম্প থেকে। কিন্তু পুনরায় দলবদ্ধ হয়ে ক্যাম্পে এলো। তারপর আমরা পিছিয়ে গেলাম। দুঃখের বিষয় এই যে, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ পর্যন্ত আনা যায়নি।

আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম মহেন্দ্রগঞ্জ। আসার পর আবার বিভিন্ন কৌশলে ধানুয়া-কামালপুরে যুদ্ধ শুরু করি। শুধু তাই নয়, হলদিয়া বারোমারি সীমান্তে যুদ্ধ করি। শত্রু বাহিনীর অনেকে নিহত হয়। আমাদের মাঝেও অনেকজন শহীদ হয়। এরপর একদিন সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের কোম্পানী কমান্ডার নাসির সাহেবকে বললেন, নাসির সাহেব খোলাবাড়ি হাই স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করুন। সেই মোতাবেক নাসির সাহেব তার কোম্পানির লোকজনকে সাথে নিয়ে রেশন ও গোলাবারুদসহ নৌকাযোগে খোলাবাড়িতে এসে ক্যাম্প স্থাপন করলেন। এখান থেকে অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি যুদ্ধে আমরা পাকহানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করি।

এরপর হঠাৎ করে একদিন ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের দুইজন মুক্তিযোদ্ধা পাঠান। তখন কোরবান মজনু মনোয়ার হোসেন তাপস ও আমাকে তাহের সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিল। তিনি জামালপুরে পাকবাহিনী কী অবস্থায় আছে তা দেখার জন্য আমাদের বললেন। মুন্সী, কোরবান, মজনু সেখানে গেল। সেখানে পাকবাহিনী ..ধরা পরে এবং তাদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। ছাড়া পেয়ে তারা ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জ আসল। এবং সব ঘটনা বলল। তারপর মেজর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল প্রস্তুতি নিয়ে তাহেরের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের কামালপুরের ওপর ভয়াবহ আক্রমন চালায়। আবু তাহের ও ভারতের অধিনায়ক নিয়োগী আমাদের বলল যে, আজ রাতে আমরা অপারেশনে যাব। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হল এবং সেই যুদ্ধে মেজর আবু তাহের তার পা হারালেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হল।

ভারত ছেড়ে এরপর সবাই জামালপুর এবং পিটিআই ক্যাম্পের চারদিকে সৈন্য মোতায়েন করল। সেখানে তুমুল যুদ্ধ হলো। অনেক পাকহানাদার মারা গেল। তারপর সেখানে বিমান আক্রমণের জন্য সংবাদ দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ভারতীয় বিমান এসে পিটিআই ক্যাম্পে অনেক বোমা বর্ষণ করল। ফলে পিটিআই ক্যাম্পে একটি বড় ধরনের পুকুর সৃষ্টি হল। এরপর পাকবাহিনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ সামনে রেখে হাত উপরে তুলল এবং

আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু আমাদেরও অনেক লোক মারা গেল। এরপর ফয়জুর রহমান ১৬ ডিসেম্বর দুপুর ১২টার সময় লাল-সবুজ পতাকা উত্তোলন করলেন এবং বাংলাদেশের বিজয় ঘোষণা করলেন।

আমাদের দেশে যত মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা সবাই বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা । কিন্তু দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে বলতে হয় যে, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুর রহিম এখন নানা ধরনের অসুখে ভুগছেন। তাকে দেখার মত কেউ নেই। যারা দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের আমরা স্মরণ করি, সাহায্য করি না। আমরা ছোট মানুষ, আমাদের সামর্থ্য নেই যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ রহিমকে সাহায্য করব। তাকে আমরা কিছুই করতে পারছি না। তাকে সাহায্য করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সূত্র: জ-২৫৯

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. পারভেজ মামুন	**মো. আ. রহিম (মুক্তিযোদ্ধা)**
জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়	গ্রাম : রামনাগড়, জামালপুর
দশম শ্রেণি, বাণিজ্য বিভাগ, রোল : ৮	সম্পর্ক : কাকা

একজন আমাকে সালাম দিল

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি সরকারি চাকরিতে কর্মরত ছিলাম। তখন আমি ময়মনসিংহের কলেজ রোডের এক বাসায় ভাড়া থাকতাম। সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরিবার আমাদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে ভারতে চলে গেল। আমরাও কয়েক দিন পর বাড়িতে চলে যাওয়ার নিয়েছি। যানবাহন বন্ধ। বড় বড় পুল ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই সময় আমরা এবং আরো পাঁচটি পরিবার ৫-৬টি রিকশা নিয়ে কোনোক্রমে ময়মনসিংহ হতে ফুলবাড়িয়া থানা হয়ে কেশবগঞ্জ নামক একটি বাজারে উপস্থিত হলাম। সেখানে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়েদের ছয়টি ভাড়া করা গরুর গাড়িতে উঠিয়ে আমরা হেঁটে হেঁটে চললাম। রাত নয়টার সময় পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে ধলাপাড়া চৌধুরী বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। সেটি মামার শ্বশুর বাড়ি। আমরা ৩৫-৩৬ জন লোক ওই বাড়িতে রাত্রিযাপন করলাম। সকালের দিকে প্রায় ১০০ জন লোক ঢাকা হতে এসে উপস্থিত হলো। তারা বাইরের বাংলোঘরে রইল। পরদিন কোনো রকমে ওখান থেকে বিদায় নিলাম কারণ আমি বাড়ির কোনো সংবাদ জানি না। বাকি সবাই রয়ে গেল। যাতায়াতের কোনো যানবাহন নেই। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটা পথ ধরলাম। ঘাটাইলের ৫ মাইল পশ্চিমে গ্রামের বাড়ি আথাইল শিমুলে রাতে এসে পৌঁছলাম।

১৪-১৫ দিন বাড়িতে থেকে কয়েকজন যুবককে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আবার ময়মনসিংহ যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম। মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে বাস থামিয়ে আমাদেরকে পাকবাহিনী চেক করতে লাগল। কয়েক গাড়ির লোক একত্রে লাইনে দাঁড় করেছিল। এরপর প্রত্যেককে চেক করা শুরু করে। আমার পাশের জনকে পাকবাহিনীর এক জন বলল, তুমি কালেমা মজিদ বাতাও। সে ব্যক্তি বলল, 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইলাবিলাহিল আলিয়িল আজামী। পাকবাহিনীর ওই লোক বলল, 'ঠিক হায়, ঠিক হায়, তোমতো আচ্ছা আদমী হায়।' আমার ব্যাগটা একটু দেখল। লাইন হতে বের করে ২০-২৫ জন লোককে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেল। আমিসহ অন্যরা ছাড়া পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ময়মনসিংহে গিয়ে দেখি আমার বাসাটা লুট হয়ে গেছে। সব জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। শহরে লোকজন নেই বললেই চলে।

আমি সানকিপাড়াতে এক বন্ধুর সঙ্গে অফিসে রইলাম। হাট-বাজার হয় না। ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে থাকতাম। একদিন ট্যুরে যাওয়ার পথে শম্ভুগঞ্জ গুদারাঘাটে আমাকে পাকসেনারা তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গেল। কারণ আমার ব্যাগ চেক করে একটি চাকু পেয়েছিল। ক্যাম্পের মেজর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ওই চাকু দিয়ে আমি কয়জন লোক মেরেছি ইত্যাদি অনেক কথা। তারপর অবশ্য আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, আর যেন চাকু

ব্যাগে না রাখি। চাকুটা ছিল আমার মেছওয়াক চাছার জন্য। ওখান থেকে ফেরার পথে দেখি বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলের সামনে পাকবাহিনী দুজন মুচিকে গুলি করে হত্যা করেছে।

একদিন আমি বাড়িতে যাচ্ছি। মধুপুর বাসস্ট্যান্ডে সবাইকে নামিয়ে লাইন করাল এবং পাকবাহিনী পরিচয়পত্র চেক করা শুরু করল। একজন পরিচয়পত্র সঙ্গে আনেনি। সে তার রেশন কার্ডটি দেখাল। পাকসেনাটি একেবারেই মূর্খ ছিল, তাই সে রেশন কার্ডটিকে পরিচয়পত্র মনে করল এবং তাকে ছেড়ে দিল। আমাকে চেক করল না, তাই আমি ভয়ে ভয়ে রওনা হলাম। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, অন্ধকারে সামনের বেশীদূর দেখা যায় না। বর্ষার শেষের দিকে তখন। একটি রাস্তায় নেমেছি। হঠাৎ দুইজন বন্দুকধারী লোকের সামনে পড়ে গেলাম, তাদের একজন আমাকে সালাম দিল। তখন আমি তার দিকে চেয়ে দেখলাম। সে ছিল একজন পরিচিত মৌলভী। তাঁর দোকান হতে আমি অনেক সময় সদাইপত্র ক্রয় করতাম। আমি তার নিকট হতে আমার বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা ভালোভাবে জেনে নিলাম। তাই রাজাকারবাহিনীর অন্য লোকটি আমাকে আর কিছু বলল না। বাড়িতে এসে দেখতে পেলাম ভুয়াপুরে পাকবাহিনী আগুন দিয়ে বাজার পুড়িয়ে দিয়েছে। ছাব্বিশা গ্রামে আগুন লাগিয়ে কয়েকটি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এবং কিছু লোককে হত্যা করেছে। এর কয়েকদিন পর বল্লব বাড়িতে অস্ত্রভর্তি একটি জাহাজে মুক্তিযোদ্ধারা আগুন লাগিয়ে দিয়ে পরে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে।

সূত্র: জ-৩৮২

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. মুমিনুল হক (আসিফ)	**মো. মতিউর রহমান তালুকদার**
যমুনা সার কারখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ঠিকানা : বিশ্বাস বেকা, বক-এ
শ্রেণী-৬ষ্ঠ, শাখা-ক, রোল-৩	বাড়ি নং-১৩/১১, টাংগাইল
	বয়স : ৭০ বছর, সম্পর্ক : নানু

যোদ্ধাদের লাশ নিয়ে আসি

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমি যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতে যাই। কিন্তু ছোট হওয়ায় আমাকে নেয় না, আমি মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসি। তারপরের দিন ছিল শুক্রবার জুম্মার দিন। আমি ও বাবা নামাজ পড়তে মসজিদে যাই। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব আমার বাবা ও চাচাকে থাকতে বলেন। আমার চাচা মান্না ছিল আলবদর। ইমাম সাহেব ছিলেন আমার চাচাতো ভাই। তো, ইমাম সাহেব বাবাকে বললেন, চাচা মিয়া, সফি তো মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে গিয়েছিল। ভালো যে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তা না হলে বিপদে পড়তে হতো। আপনাদের ওপর জুলুম হতো। দেশ ছাড়তে হতো। এক কাজ করেন, কাল আমি ওকে সাথে করে নিয়ে বদর বাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দেব। শান্তিতেও থাকতে পারবেন, কেউ অত্যাচার করবে না। ইমাম সাহেব বিভিন্ন লোক জোগাড় করে বদর বাহিনীতে ঢোকান। বাবা ছিলেন সাদাসিধে মানুষ। তিনি বললেন, ওসব আমি বুঝি না মান্না, বারেক আছে ওরাই ভালো বুঝবে। কিন্তু আমার চাচা মান্নান এবং বারেকও বদর। শেষে সিদ্ধান্ত হলো, কাল সকালে আমাকে বদর বাহিনীতে যোগদানের জন্য নিয়ে যাবে। চিন্তায় পড়ে গেলাম। কি করি? আমিতো বদর বাহিনীতে যোগ দেবো না। তাই বাড়ি থেকে চুরি করে ধান বিক্রি করলাম। সব মিলিয়ে ৮০ টাকা হলো। একবার যাই, আবার ভাবি, বাবা-মাকে না বলে কেমনে যাই? এরপর রাত ১০টার দিকে উঠে একটা বালিশ ও একটা কাঁথা নিয়ে বাবা-মাকে না ডেকে সালাম করে চুপি চুপি বেরিয়ে দরজায় পিঁড়ি দিয়ে ঠাসা দিয়ে রেখে কাঁদতে কাঁদতে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

গুঠাইল-এর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ধারে ছিল একটি বাঁধা নৌকা। নৌকাওয়ালাকে আমি আগেই বলে রেখেছিলাম। সেদিন আমার সাথে আরও কয়েকজন ছিল। সকলেই রওনা হলাম মহেন্দ্রগঞ্জের উদ্দেশে। সেখানে

যাবার পর আমাদের শরণার্থী কার্ড দিল। শরণার্থী হিসেবে সেখানে কিছুদিন থাকলাম। সেখানেও মুক্তিযোদ্ধা বাছাইয়ে আমাকে নেয় না। বলে, এই ছোট মানুষ কি পারবে ? আমি একটি কাঁঠাল গাছের নিচে বসে কাঁদতে থাকি। আমার সাথে আসা আমার বন্ধু ওয়াহেদ টিকে যায়, কিন্তু আমি টিকি না। এরপর ওয়াহেদ সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহেরর কাছে গিয়ে অনুরোধ করে। বলে, ও আমার সাথে এসেছে, ওর কেউ নেই। বর্তমানে ও একা এবং বাড়ি ফিরতেও পারবে না। এই ধরনের অনুরোধ হলে তিনি রাজি হন। সাথে সাথে আমি খুশিতে দৌড়ে গিয়ে ট্রাকে উঠলাম।

সেখান থেকে আমাদের পাঠাল ঢালুতে। সেখানে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। কিছুদিন পর শিখ প্রশিক্ষক আসেন। এবং উচ্চতর ট্রেনিং এর জন্য ২০০ জনকে নির্বাচিত করেন। সেখানেও আমাকে নিতে চায় না। পরে আমার টেস্ট নেয়, তা দেখে তারা অবাক হয় এবং আমাকেও বাছাই করে এবং ট্রেনিংয়ের জন্য নিয়ে যায় তুরাতে। সেখানে সকল ট্রেনিং শেষ করার পর শুরু হয় আমার রক্ত আমাশয়। আমার বাদ শুধু শপথনামা। আমার এ দুরবস্থায় বন্ধু ওয়াহেদ সম্পূর্ণ খেয়াল রাখে। সে-ই ময়লা পরিষ্কার করে। এ সময় প্রচন্ড যুদ্ধ বেধে গেছে। সকলকে যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। এখন এই শপথ পিরিয়ড শেষ না করলে এর পরের ব্যাচের সাথে আবার নতুন করে ট্রেনিং নিতে হবে। ওয়াহেদকেও যেতে হবে। ওয়াহেদ বলল, স্যার, সফিকে ছেড়ে আমি যাব না। এসেছি একসাথে, যদি মরি তবুও একসাথে। শিখ ওস্তাদ বলল, তুমি না গেলে তোমাকে শ্যুট করব।

এরপর ওয়াহেদ সেক্টর কমান্ডারকে খবর দেয়। তিনি আমাদের গুঠাইলেরই মানুষ। আমার পরিচয় দেয়ার পর তিনি লোক পাঠান। লোক আমাকে ধরে তুলে নিয়ে যেয়ে গোসল করায় এবং আমার বিছানা পাল্টিয়ে দেয়। এরপর আমাকে ওয়াহেদকে দিয়ে খাইয়ে শপথের জন্য তৈরি করে নিয়ে আসে। আমাকে তিনজন ধরে ছিল। আমার সামনে একটি ট্রে নিয়ে এলো, এতে চার ধর্মের প্রধান কিতাব ছিল। কুরআন, গীতা, ইঞ্জিল ও বৌদ্ধদের জন্য। আমি কুরআন ধরে কসম পিরিয়ড শেষ করলাম। এরপর আমাদের ট্রাকে তোলা হলো। আমাকে ট্রাকের শেষের কানিতে পা গুটিয়ে শোয়ার মতো জায়গা করে দিল। আমি মাথার নিচে লুঙ্গি পেঁচিয়ে শুয়ে পড়লাম। ওয়াহেদকে আমার সাথে বসালো এবং তার কাছে খাবার পানি দিয়েছিল কর্নেল তাহের। পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য কাপড় ও গ্লাভস দিয়েছিল। আমাদেরকে পাঠান হলো পুরাকাসিয়া। সেখানে গিয়ে শাক-সবজি ইত্যাদি খেয়ে কিছুদিনের মধ্যে ভাল হয়ে গেলাম। সেখানে আমাদের কমান্ডার ছিলেন গোলাম মাওলা। তিনি একদিন এসে বললেন, তোমরা প্রস্তুত হও। উপর থেকে অর্ডার এসেছে, পাকদের ডিফেন্স নকশি দখলের জন্য যেতে হবে। গোলাম মাওলাকে ৩৩৩ মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে এই মিশনে পাঠানো হয়। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।

দূর থেকে প্রায় ২ মাইল পর্যন্ত দুদিকে প্রসারিত হয়ে আমরা নকশিকে ঘিরে এগোচ্ছিলাম ধীরে ধীরে । তখন সময় ছিল রাত প্রায় দেড়টা। হঠাৎ পাকবাহিনী কিভাবে যেন বুঝতে পারল যে, ওদের ওপর আক্রমণ হতে যাচ্ছে। তারা আমাদের ওপর একটানা গুলিবর্ষণ শুরু করে। সেই সাথে ২ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি মর্টারের গোলা ছুঁড়তে থাকে। আমাদের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে যায়। রাত পেরিয়ে দিন আসে; কিন্তু তারা থামে না। বেলা ২ টার দিকে ছয় পাউন্ডের একটি মর্টার গোলা ঠিক আমার ডান পাশে পড়ে। যার ওপর পড়ল আমি তাকে দেখতে পেলাম না। শুধু তার মাংস পিণ্ডগুলো ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম। কিন্তু তাতেও আমি সাহস হারাইনি। মর্টারটি একটু দূরে পড়ার পরও এর শব্দে আমার ডান কানের পর্দা ফেটে যায় এবং গোলার টুকরা দ্বারা ডান পায়ের গোঁড়ালির মাংস উড়ে যায়। তখনই আমি সেখানে এক খামছা বালি নিয়ে আঘাতের স্থানে চেপে ধরি। কিন্তু তাতেও রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যে বালিও রক্তে ভিজে যায়।

বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণের কারণে ক্যাম্প থেকে খাবার নিয়ে কেউ আমাদের কাছে আসতে পারছিল না। না খেয়ে ২ রাত ও ২ দিন থাকতে হয়েছিল। ক্ষুধার জ্বালায় আমি নড়তে পারছিলাম না। কিন্তু গুলিবর্ষণও থামছে না। করি কি? আমার অবস্থান যেখানে ছিল তার কিছু দূরে একটি পানির ড্রেন ছিল। এই ড্রেন দিয়ে আমি এবং আরো দুজন লুকিয়ে লুকিয়ে যাচ্ছিলাম। যাতে কেউ দেখতে না পারে সে জন্য ড্রেনে নাক ঘষতে ঘষতে যেতে হয়। কিছুদূর এসে দেখি একটা ঘর। সেই ঘরে আমরা ক্রলিং করতে করতে যাই। ঘরের ভেতর ছিল একজন বৃদ্ধ ও তার।

তাদের গিয়ে বললাম, আমাদের খুব ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও। বলার সাথে সাথে তারা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। বলল ২ দিন যাবত ঘরে খাবার কিছুই নেই। বৃদ্ধ লোকটির ছেলে রোজগারের জন্য বাইরে গেছে। এখন কী উপায় ? নিরাশ হয়ে পড়লাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি একটি লাউয়ের জাংলা। তাতে প্রচুর লাউ ঝুলছে। আমরা তিনজন গিয়ে কিছু লাউ ও লাউয়ের ডগা ছিঁড়লাম। মহিলাকে বললাম, এগুলো তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করে দাও। সে সিদ্ধ করে আনল। তখন ভর্তা করতে হবে কিন্তুবড় বাসন তো নেই। যাহোক, কোনোমতে ব্যবস্থা হওয়ার পর মাখতে গিয়ে দেখি পেয়াজ মরিচ নেই। অনেক খোজাখুজি করে ১টি মরিচ পাওয়া গেল। তারপর শুধু মরিচ দিয়েই মাখলাম। মেখে আমরা এবং ওরা মিলে খেলাম। তখন বাজে সকাল ৯টা। খেয়ে নিয়ে ১টা বিড়ি ধরিয়ে টান দেওয়ার সাথে সাথে মাথা ঘুরে পড়ে যাই। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এক ঘরের উঠানে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে যেভাবে এসেছি সেভাবে আমরা ফিরে গেলাম।

ফিরে গিয়ে আগের ডাক নেবার ১ মিনিট পর কমান্ডার এসে হাজির। কমান্ডার বলল, সফি খুব কষ্ট হচ্ছে? আমি বললাম, জী স্যার

কিন্তু কোনো সমস্যা নাই। কমান্ডার বলল, সবাই না খেয়ে আধমরা হয়ে উঠেছে। মধ্যরাতে আমরা ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

ক্যাম্পে ফেরার পর বিএসএফ ক্যাপ্টেন আমাদের লাইন করায়। দেখে ৩৩৩ জনের মধ্যে ৩৩০ জন ফৌজ আছে। ক্যাপ্টেন বলল, আর তিনজন কোথায় ? কেউ কিছুই বলে না। আমিও চুপ করে আছি। এই যুদ্ধে কেউ যদি মারা যায় তার দেহ বা তার শরীরের অংশ নিয়ে আসতে হবে। তার সেই দেহ বা শরীরের অংশ ধুয়ে জানাজা শেষে কবর দেবে। ক্যাপ্টেন বলল, না বলা পর্যন্ত কাউকে কিছু খেতে দেয়া হবে না। তবুও ভয়ে কেউ বলে না। পেছন থেকে কুকার আমাদের হাতের মুঠোয় এক মুঠ করে খিচুড়ি চুরি করে দিয়ে যায়। এরপর আমাদের আবার সেখানে পাঠানো হয়। সেই লাশ তিনটির চিহ্ন নিয়ে আসার জন্য। আবার আমরা যেভাবে ক্রলিং করতে করতে এসেছিলাম সেভাবে ক্রলিং করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাই এবং মৃত যোদ্ধাদের লাশ নিয়ে আসি। এর পরের দিন ১-৪০ মিনিটে আমাদের খাবার দেয়। এই রকম কষ্টে সেই দিনগুলো পাড়ি দিই। এই কষ্টের কথা সহজে ভোলা যায় না।

আমাদের ব্যবহারের জন্য একটি ছোটখাটো ৪ বাই ৪ ফিট পলিথিন দেয়া হয়। আমাদের হয়তো ২-৩ দিন এক পাহাড়ে আবার ২-৩ দিন আরেক পাহাড়ে থাকতে হয়। বৃষ্টি বাদলের দিন মাথার ওপর কোনো ছাদ নেই, কাঁথা নেই, নেই বালিশ। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১টি পলিথিন মাঝখানে ছিঁড়ে গাছের সাথে বাঁধি। একটির চারকোণা চারদিকে টানা দিই ও আরেকটি বিছাই। সেই ৪-৪ ফিট পলিথিনের ওপর আমরা একসাথে দুইজন গলাগলি ধরে শুয়ে থাকতাম।

এরপর আমাদের পাঠানো হয় শেরপুর, আবার শেরপুর থেকে ৩ দিনের জন্য জামালপুর পাঠায়। এরপর জামালপুরে পাকসেনাদের সাথে আমাদের ৩-৪ দিন যুদ্ধ হয়। এর মধ্যে পাকিস্তানিরা সারেন্ডার করে। তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়। আমাদের কাছে যুদ্ধের সময় তেমন কোনো অস্ত্র ছিল না। পাকদের সাথে যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছি। এরপর সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতার বাণী ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের চরপাড়া বোর্ডিং হোস্টেলে ২ দিন রাখা হয় এবং চিকিৎসা করা হয়। এরপর আমাদের ছুটি দেয়া হয়। আমরা অস্ত্রসহ বাড়ি ফিরলাম। ফিরে বেশ কয়জন বদর ও গরিবের ওপর জুলুমকারীদের মেরে ফেললাম। ৩ দিন পর ময়মনসিংহে অস্ত্র দেয়ার জন্য বলা হয়। আমরা ময়মসসিংহ গিয়ে পুলিশলাইনে অস্ত্র জমা দিই এবং বাড়ি ফিরে আসি।

সেই দিনগুলোর কথা কখনও ভোলা যায় না। কী করে সম্ভব ভুলে যাওয়া ? এই দেশের জন্য কত প্রাণ মা-বোনের ইজ্জত, কত ভাইয়ের রক্ত দিতে হয়েছে। এত সহজে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি।

সংগ্রহকারী :
মো. ফয়ছাল তালুকদার
জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়, জামালপুর
শ্রেণি: দশম, শাখা : বিজ্ঞান, রোল-১৮

বর্ণনাকারী :
মো. সফিউর রহমান (মুক্তিযোদ্ধা)
গ্রাম : গিলাবাড়ী (গুঠাইল), ডাকঘর : গিলাবাড়ী
থানা : ইসলামপুর, জেলা : জামালপুর
বয়স : ৪৮, সম্পর্ক : ফুপা

বাবা কেন পায়নি

আমার বাবা একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা। নাম মোঃ হেলাল উদ্দিন। তিনি বর্তমানে দেওয়ানগঞ্জ জিলবাংলা চিনিকলে চাকরিরত আছেন। আমরা সপরিবারেই বাবার সাথে এখানে বসবাস করছি। আমি বাবার কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু ইতিহাস শুনেছিল। তারই মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা নিচে দেওয়া হলো।

আমার বাবা ছিলেন ১১ নং সেক্টরের আওতাধীন ফরহাদ কোম্পানির একজন গোয়েন্দা রিপোর্টার। ফরহাদ হোসেন ছিলেন শেরপুর জেলার নকলা থানাধীন নারায়ণখোলা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ইপিআরে চাকরি করতেন। আমাদের বাড়িও ছিল একই গ্রামে।

ফরহাদ হোসেন ইপিআরের চাকরি ছেড়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ভারতে যাওয়ার পরপরই বাবাও ভারতে যান। কিন্তু ফরহাদ হোসেন বাবাকে সেখানে থাকতে না দিয়ে নিজ গ্রামে ফেরত আসতে বলেন। বাবাকে রাজাকার, আলবদর ও পাকসেনা ক্যাম্পের গোপন সংবাদ সংগ্রহ এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাকে ব্রহ্মপুত্র নদী পারাপার এবং খাওয়ার ব্যবস্থাসহ নানা প্রকার দায়িত্ব অর্পণ করেন। একদিকে ছিলেন বাবার বৃদ্ধা মাতা, অপরদিকে ছিল সংসারের নানা অভাব-অভিযোগ। আমাদের বাড়িটি ছিল ব্রহ্মপুত্র নদির পাড়ে সদর রাস্তার ধারে। যে রাস্তা ধরে ভারত হতে হালুয়াঘাট ও নালিতাবাড়ী হতে সুদূর পিয়ারপুর পর্যন্ত যাওয়া যেত।

একদিন বৃহস্পতিবার দুপুরে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এসে বাবাকে খুঁজে বের করেন। বিকেলে আমাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন। বাবার সাথে নদী পার হয়ে বেগুনবাড়ি রেল ব্রিজ ধ্বংস করার জন্য যান। ওইদিন কিছু পাকসেনাসহ রাজাকার-আলবদর বাহিনীর একটি দল নকলা ক্যাম্প হতে এসে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করে। নদীর পাড় ধরে তারা ফরহাদ কমান্ডারের বাড়ির দিকে রওনা হলে আগত মুক্তিযোদ্ধাগণ নারায়ণখোলা বাজারের দক্ষিণে স্কুলসংলগ্ন একটি উঁচু রাস্তার প্রান্তে এমবুসের ফাঁদ পেতে বসে থাকে। কিন্তু ফেরার পথে ওই রাস্তা দিয়ে না ফিরে পাকসেনারা পেছন দিক থেকে 'দরবার চর' গ্রামের ভেতর রাস্তা দিয়ে বাজার সংলগ্ন একটি বটগাছের আড়ালে দাঁড়ায়। সেখান থেকে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হাজার হাজার গুলি ছুঁড়তে থাকে। ফলে বহু মুক্তিযোদ্ধা সেখানে নিহত হয়। ২-৪ জন পাকসেনাও নিহত হয়। বাবার বিশিষ্ট বন্ধু নুরুল আমীন, কোরবান আলী, আশরাফ আলী রোপাধান চাষ করার জন্য জমি তৈরি করছিল, সেই গোলাগুলিতে তারাও মারা যায়। তাছাড়া গফরগাঁওয়ের যেসব মুক্তিযোদ্ধা এখানে এসেছিল তাদের মধ্যে আলী আকবরসহ আরও কয়েকজন সেই গোলাগুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

সেই যুদ্ধের সময় বাবার ডান পায়ে গুলি লাগে এবং তিনি পঙ্গুত্বের শিকার হন। পরবর্তীতে বাবা হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা আরোগ্য লাভ করলেও পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পাননি। সে জন্য বাবা দুঃখ প্রকাশ করেন না। দুঃখ করেন শুধু এই বলে যে, রান্নাকরা ভাত মুক্তিযোদ্ধারা খেতে পায়নি। নুরুল ও কোরবান আলী কেন মারা যাবে, ওরা তো ছিল অত্যন্ত নিরীহ মানুষ। মুক্তিযোদ্ধারা যেখানে শহীদ হলো, সেখানে কেন একটি স্মৃতিসৌধ হতে পারল না। কত লোক মুক্তিযোদ্ধার কত সনদপ্রাপ্ত হলো, বাবা কেন পায়নি? আজ ফরহাদ হোসেন বেঁচে নেই, সাথের বহু লোকও বেঁচে নেই। কী কারণে এমন হলো কার কাছে বাবা কৈফিয়ত চাইবেন? বাবাকে প্রশ্ন করলে উত্তর দেন, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে এটাই বড় সান্ত্বনা কিন্তু যে উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা লাভ করেছে সঠিকভাবে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত রোমাঞ্চকর ঘটনা বাবার কাছে শুনে আমি অভিভূত হয়ে যাই ।

সূত্র: জ-১৪৩

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. রাউফুল আলম (রুহেল)	**মো. হেলাল উদ্দিন**
জিলবাংলা সুগার মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়	জিলবাংলা সুগার মিলস্ উচ্চ বিদ্যালয়
শ্রেণী: ৭ম, রোল : ০৯	হিসাব বিভাগ (ইক্ষু)
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর

মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে

আমি বিভিন্ন সময় আমার বাবার মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা শুনেছি । এখন আমি বাবার জবানিতে সেই স্মৃতিচারণ তুলে ধরব ।

আমার বাবা এম. এ. মান্নান চাকরি করতেন ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ঢাকা অফিসে । সেই সুবাদে আমরা ৭ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারটি মালিবাগে থাকত । ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর ঢাকার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে । তাই আমরা আমাদের আবাসভূমি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে চলে আসি মার্চ মাসের ২০ তারিখে । ২৫ মার্চ পাকবাহিনীর ক্র্যাক ডাউনের পর সারাদেশে যুদ্ধ শুরু হয় । কিন্তু চৌদ্দগ্রামে তখনো শুরু হয়নি । শুধু শোনা যাচ্ছিল, হানাদার বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে ।

গ্রামটি থানা সদরে অবস্থিত । তাই সেখানকার উৎসাহী যুবকেরা নিজেদের উদ্যোগে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল । তারপর সকলে মিলে আধা কিলোমিটার দূরে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেল ।

আমার বড় চাচা এয়ার ফোর্সের সার্জেন্ট ছিলেন । এপ্রিলে দেশে এসেছিলেন, তারপর আর যাওয়া হয়নি । তিনি আমাদের গ্রামে কিছু মানুষকে জড়ো করে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করলেন । যুদ্ধের মধ্যে কীভাবে চলাফেরা করতে হয়, ক্রলিং করে কীভাবে একস্থান থেকে অন্যস্থানে এগোতে হয় ইত্যাদি শেখাতে থাকলেন ।

যুদ্ধ চলাকালীন এক শুক্রবারে মুসল্লিরা নামাজের জন্যে মসজিদে জমায়েত হয় । এমন সময় গ্রামের পশ্চিম দিক থেকে দূর পাল্লার মর্টারের শেলিং শুরু হয় । পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় । আমি, বাবা ও আমার ভাইয়েরা ভারত থেকে আসা একটা খাল পেরিয়ে ভারতের রামামুড়া নামক গ্রামের এক হিন্দু বাড়ির উঠানে আশ্রয় নিই । পরদিন সকালে আমরা বাড়ি ফিরে ধান, চাল, দলিল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস ঘরের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে চাপা দিই । সেদিন রাতে আমাদের বাড়ির কুকুরগুলো খুব ডাকাডাকি শুরু করল । আমার দাদা এসে বললেন, হানাদার বাহিনী আসছে । তিনি আমাদের সবাইকে লুকোতে বললেন । আমার ছোট ভাই বোন নিয়ে ধানের গোলায় লুকালাম । পাঞ্জাবিরা এসে আমাদের বাড়ির সামনে হাঁক-ডাক শুরু করল । দাদা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন । একজন পাঞ্জাবি জিজ্ঞাসা করল, মাকান খালি কিউ, উদারতর কো-ই আদমী হ্যায় । উত্তরে দাদা বললেন, হামারা ছেলে পুলে ঢাকায় চাকরি করতা হ্যায় । উদার আর কেওই নেহি হ্যায়? তার কথায় পাঞ্জাবিটা সন্তুষ্ট হলো । তারপর আবার প্রশ্ন করল, এধার মুরগি হ্যায়, দেখি হামছে দে দো । দাদা-দাদি তাদের হাতে চারটি মুরগি ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় করলেন । আমরা অনেকেই গোলার ভেতর থেকে উঁকি মেরে দেখেছি । এবং সেটাই আমাদের হানাদার বাহিনী দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা ।

থানা সদর হওয়ার কারণে পাকিস্তানিরা আমাদের পাড়ায় ক্যাম্প স্থাপন করে । পুলিশ স্টেশন তারা দখল করে আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজে লাগায় । পাশেই দিঘির পাড়ে তারা বাংকার তৈরি করে । চিটাগাং হাইওয়েটা ছিল আমাদের গ্রামের মাঝ দিয়ে । কিন্তু হানাদার বাহিনী সেটা ব্যবহার করত না । কারণ মুক্তিবাহিনী আগেই পুলগুলো উড়িয়ে দিয়েছিল । একদিন দুজন হানাদারকে আধামরা অবস্থায় ধরে নিয়ে এসেছে মুক্তিযোদ্ধারা । ঘটনাস্থলে গিয়ে

দেখলাম একজন আগেই মারা গিয়েছে। বাকি একজন বেঁচে আছে। তাকে কিছু লোক লাথি মারছিল। একজন লাঠি এনে কয়েক ঘা দিতেই কাতরাতে কাতরাতে সে মারা গেল। যারা পরে এসেছে জীবিত অবস্থায় ওকে মারতে পারেনি। তারাও লাশটাকে দু চার লাথি দিয়ে গেল।

ডিসেম্বরের ১২ তারিখ। মুক্তিবাহিনীর কিছু সদস্য আমাদের পাড়ায় এসে সকল সক্ষম পুরুষের সাহায্য চাইল। অনেকেই এগিয়ে গেল, তাদের মধ্যে আমার বাবাও ছিল। সেদিন পুরো রাত যুদ্ধ হলো। মুক্তিযোদ্ধারা একটার পর একটা লাশ নিয়ে আসতে থাকল। বেশির ভাগই পাকহানাদার, তার মধ্যে কিছু আহত এবং নিহত মুক্তিযোদ্ধা। এই দেখতে দেখতে মনে ভয় ঢুকে গেল। মনে হলো এই বুঝি আমার বাবার লাশও দেখতে হবে। ভোর হতে তারা ফিরে এলো এক অপরিচিত লোক নিয়ে। বাবার মুখে শুনলাম যুদ্ধের ময়দানে মুক্তিযোদ্ধারা আগে ছিল, আর ভারতীয় সৈন্যরা পিছে। তারা পাকহানাদারদের ভোরের দিকে স্কুলে স্থাপন করা ক্যাম্প থেকে হটিয়ে দেয়।

সকাল হতেই গ্রামের মসজিদের দিক থেকে মানুষের হাঁকডাক ভেসে আসছিল। মসজিদের সামনের বড় বটগাছের ওপর এক পাকিস্তানিকে দেখতে পেয়ে লোকজন চিৎকার শুরু করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা এসে সেই বটগাছটা ঘিরে ফেলে। তাকে গাছ থেকে নামতে বাধ্য করে। কেউ কিছু করার আগেই সে পিস্তল বের করে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে।

আশা করি, আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া সামান্য স্মৃতিটুকু কিছুটা হলেও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে।

সূত্রঃ জ-৩৯২

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মাসাদ ইবনে মারুফ	**গোলাম মারুফ জসিম**
যমুনা সার কারখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : কিংশ্রীপুর, ডাক : চৌদ্দগ্রাম
১০ম শ্রেণি	থানা : চৌদ্দগ্রাম, জেলা : কুমিল্লা
তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর	বয়স : ৪৪ বছর

বাড়ি এসে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন

আমি আমির স্যারের কাছ থেকে শোনা ঘটনাটি নিচে হুবহু তুলে ধরছি–

আমির স্যার ১৯৭১ সালে ছিলেন ১৬ বছরের একজন কিশোর। তিনি ১৯৭০ সালে জামালপুর কেন্দ্র থেকে মেট্রিক পরীক্ষা দেন। পড়াশোনার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় দেশের হালচাল সম্পর্কে তার তেমন ধারণা ছিল না। পরীক্ষা শেষ হলে তিনি তার বাড়িতে চলে আসেন। এর কয়েক দিন পরই এলো সেই বিভীষিকাময় ২৫ মার্চ। রাত পোহালে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো ঢাকার করুণ অবস্থার কথা। স্যারও শুনলেন সে কথা। বর্বর পাকিস্তানি শাসকদের রুখতে সারা দেশের আপামর জনসাধারণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। দেশের অন্যান্য স্থানের মতো টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর থানার অন্তর্গত বীরতারা ইউনিয়নের কেন্দুয়া বাজারে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প করল। সেখানে দিনরাত্রি মুক্তিসেনারা ট্রেনিং গ্রহণ করছিল। তাদের দেখে স্যারের মনেও যুদ্ধে যাবার ইচ্ছা জাগে। বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে বলেন তার ইচ্ছার কথা। কিন্তু তার মা-বাবা তাকে কোনোভাবেই যুদ্ধে যেতে দিতে রাজি নন। কারণ তিনি ছিলেন বাবা-মার একমাত্র পুত্র সন্তান। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাবা-মার মুখ চেয়ে তিনি যুদ্ধে যেতে পারেননি। প্রতিদিন যেতেন সেই মুক্তিসেনাদের ক্যাম্পে। এভাবেই চলছিল সময়।

একদিন বেলা ১২টার দিকে হঠাৎ কেন্দুয়া বাজারে প্রচণ্ড হইচই শুরু হয়। স্যার তখন কেন্দুয়া বাজারের কাছাকাছি একটা দোকানে চা খাচ্ছিলেন। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে তিনি দৌড়ে গেলেন সেই জায়গায়। গিয়ে যে দৃশ্য

দেখলেন তাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কেন্দুয়া বাজারে একটি হিন্দু বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির কয়েকটি ঘরে হিন্দু লোকজন বসবাস করত। বাড়িটি কেন্দুয়া বাজারের মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত বাড়ি হিসেবে গণ্য হয়। স্যার যখন ঘটনাস্থলে গেলেন তখন দেখলেন যে বাড়িটার সামনে প্রচুর মিলিটারি উপস্থিত হয়েছে। তারা ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাদের মধ্য থেকে প্রায় অর্ধেক রাজাকার বাড়িটিতে প্রবেশ করল। তারা একে একে বাড়ির পুরুষ লোকদের ধরে নিয়ে এলো। ওই বাড়িতে তখন পুরুষ লোক ছিল ৯ জন। হানাদারেরা একে একে সবাইকে গাছের সাথে বেঁধে ফেলল। তারপর শুরু করল নির্মম অত্যাচার। প্রচণ্ড রকম শারীরিক নির্যাতন চালাতে লাগলো তাদের ওপর। মারতে মারতে প্রায় আধমরা করে ফেলল। প্রচণ্ড মারের চোটে ৩ জন ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এ সময় সেখানে পাগলের মত ছুটে এল ওই হিন্দু বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি সুরেন মেকার। তাকেও অত্যাচারীর দল রেহাই দিল না। স্যারের চোখের সামনে সুরেন মেকারকে হানাদারেরা গুলি করে মেরে ফেললো। তারপর একে একে গাছের সাথে বেঁধে রাখা বাকি ৬ জনকে বাঁধন খুলে এনে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরে ফেলল। এটুকু করেই তারা ক্ষান্ত হলো না। ওই বাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দিল। মুক্তিবাহিনী কিছুই করতে পারল না। কারণ তাদের হাতে তখনও অস্ত্র এসে পৌঁছায়নি। তারা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সারা এলাকা যেন শ্মশানে পরিণত হলো।

স্যার সবকিছু দেখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। কোনো কিছুই তার খেয়াল ছিল না। যখন হুঁশ হলো তখন আর কোনদিকে না তাকিয়ে দিগ্বিদিক ছুটে বাড়ি এসে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তার জ্ঞান ফিরে এলো প্রায় সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর।

এ ঘটনাটা স্যারের মনে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে স্যারের অনেক দিন লেগেছিল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেদিনের সেই করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনা স্বাধীনতার ৩৩ বছর পরও স্যার ভুলে যাননি। যখন তার ওই ঘটনা মনে পড়ে তখন তিনি যেন কেমন হয়ে যান। এমনকি যখন তিনি আমাকে ঘটনাটা বলছিলেন তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি ঘটনাটা প্রকাশ করতে পেরে অত্যন্ত খুশি। স্বাধীনতার অনেক পরে হলেও মানুষ যে সেই দুর্বিষহ দিনের কথা জানতে পারবে, তাতেই তার আনন্দ।

সূত্র: জ-৩৯৪

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
আফরিন জান্নাত (লিমা)	**মোঃ আমির হোসেন**
যমুনা সার কারখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : কয়া, ডাক: ডি কেন্দুয়া
শ্রেণি: ১০ম	থানা : মধুপুর, জেলা : টাঙ্গাইল
	বয়স : ৫০ বছর

মা-বোনের হাতের রান্না খাওয়া হল না

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের এক সদস্য আমি। এই মহান বীর মুক্তিযোদ্ধা আমার পিতার বড় ভাই। আমি তার কাছে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো সম্বন্ধে জানতে চাই। তিনি নিম্নোক্তভাবে তার স্মৃতিচারণ করেন।

আমি তখন সবেমাত্র ৯ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছি। স্কুলে পড়াশোনার কড়া শাসনে আমরা আবদ্ধ। কিন্তু এরই মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাঙালি জাতির ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। ২৫ মার্চ রাতে হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালি জাতির ওপর। কিছুদিনে মধ্যে পাকহানাদার বাহিনী সারা বাংলার বড় বড় শহরগুলো থেকে শুরু করে থানা পর্যায় পর্যন্ত তাদের দখলে নিয়ে নিলো। হঠাৎ এমনি একসময় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে একটি সাহসী কণ্ঠ বেজে উঠেছিল যে, আমি মেজর জিয়া বলছি। তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ২৭ মার্চ

১৯৭১। নিজ বাড়িতেই অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে সবাই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে, কেউ বা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে যাচ্ছে। আমিও ভাবছি কী করব, কোথায় যাব। মাঝেমধ্যে রেডিও ধরে খবর শুনতে লাগলাম। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে মাত্র ১২-১৩ টাকা চুরি করে পালিয়ে গেলাম ভারতের উদ্দেশে। যাওয়ার সময় বাড়িতে রেখে গেলাম আমার মা, ছোট ভাই ও দুই বোনকে।

সবার মায়া ত্যাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগলাম। পথে যেতে যেতে আমার মতো আরও অনেকের সাথে দেখা হলো। সবারই উদ্দেশ্য একটা, ভারত যাব, মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাব এবং যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করব। পথে অনেক জায়গায় অনেক বিপদেও পড়তে হয়েছে। ১০-১২ দিন হেঁটে অবশেষে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট নামক স্থানে আমার এক চাচার বাড়িতে গেলাম। সেখানেও একই অবস্থা। চাচা-চাচি আমাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, বাবা আমরাই তো বাঁচি না, তোকে কোথায় রাখব ? আমি বললাম, আমি থাকতে আসি নাই, ইন্ডিয়া যাব। মুক্তিযোদ্ধা হব। আমাকে শুধু বর্ডার পার করে দেন। তখন আমাকে দূরের গ্রামের এক বাড়িতে নিয়ে রাখল। সেখানে ২-৩ দিন রেস্ট নেওয়ার পর, যতদূর মনে পড়ে ২০ এপ্রিল রাতে ৫০ জনের একটি গ্রুপে হিলি বাগজানা বর্ডার দিয়ে পার হয়ে ভারতে চলে গেলাম।

ভারতে ঢুকে প্রথমেই বিএসএফের ক্যাম্পে আটকা পড়লাম। সেখানে সকালে ২টা করে ডালডায় ভাজা পুরি ও একমগ করে চা খেতে দিল। চা-নাস্তা খাওয়ার পর অফিসার এসে সবাইকে লাইন করে বসিয়ে সবার নাম ঠিকানা ইত্যাদি লেখার পর গাড়িতে তুলে হিলি নিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধা ভর্তি কেন্দ্রে নামিয়ে দিল। সেখানে এক রাত থাকার পর ২২ এপ্রিল তারিখে মুক্তিযুদ্ধে নাম অন্তর্ভুক্ত করি এবং ওই দিনই বিকেলে কুমরাইল কামারপাড়া (ভারত) নামক স্থানে ছোপরা অপারেশন ক্যাম্পে পৌঁছি। অপারেশন ক্যাম্পে যাওয়ার পর আমাদের থাকার টেন্টে ভাগ করে দিল এবং খাবার জন্য ২টা গেস্ট মগ ও লাইট বিছানা ইস্যু করল।

পরদিন সকাল হতে আমাদের নতুন পুরানো সবাইকে একত্রে প্রথমে ৩০৩ রাইফেল ট্রেনিং, বেয়নেট ফাইট, ক্রলিং, পজিশন, ইত্যাদি ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলেন। যারা ট্রেনিং করাতেন তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বাংলাদেশি আর্মি, ইপিআর, আনসার ও পুলিশের লোক ছিলেন। আমরা ৭-৮ দিন এভাবে ট্রেনিং নেয়ার পর এক সন্ধ্যায় ফলইন করিয়ে প্রত্যেককে একটি করে .৩০৩ রাইফেল এবং ৫০ রাউন্ড করে গুলি দিল। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে খানা খাইয়ে সবাইকে নিয়ে ওস্তাদরা আলাদা এক জায়গায় বসিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার কথা বললেন। কিভাবে শত্রু এলাকায় গিয়ে কী করতে হবে বিস্তারিত বুঝালেন। পরে রাত ৮টার দিকে বাংলাদেশের ভেতরে যেখানে হানাদার ও রাজাকার বাহিনীর ডিফেন্স, সেই উদ্দেশে রওনা দিলাম।

রাত ১২টার দিকে আমরা একটি ছোট নদী পার হয়ে এক ঝুপড়ি এলাকায় গিয়ে ঘেরাও করে পজিশন নিলাম। যথাসময়ে কমান্ডারের আদেশমতো গুলি চালানো শুরু হলো। এখান থেকেই আমার যুদ্ধ শুরু হলো। সারারাত গোলাগুলির পর ভোর রাতে পজিশন ছেড়ে দেওয়ার আদেশ হলো। আমরা আমাদের প্রশিক্ষণমতো কায়দায় সবাই নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। এই যুদ্ধে দুই জন আহত হয়। পরে জানলাম, যেখানে যুদ্ধে গিয়েছিলাম সেই জায়গার নাম বাঁশঝাড় জয়পুরহাট এরিয়া।

বর্ডার দিয়ে মাস দেড়েক বিভিন্ন জায়গায় হিট করার পর ছোপরা অপারেশন ক্যাম্প হতে অ্যাডভান্সড ট্রেনিংয়ের জন্য লোক বাছাই পর্বে আমারও নাম এলো। আমি হায়ার ট্রেনিংয়ের জন্য নির্বাচিত হলাম। জুন মাসে চলে গেলাম শিলিগুড়ির পানিঘাটা, মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ ট্রেনিং সেন্টারে। ৭ নং সেক্টরের অধীনে শিলিগুড়ি পানিঘাটা ট্রেনিং সেন্টারে দিবা রাত্রি ৪৫ দিন প্রশিক্ষণ নিলাম। প্রথম ব্যাচ (গেরিলা) কমান্ডো যোদ্ধা হিসেবে দুই উইংয়ে বিভক্ত হয়ে চলে এলাম মালদহ তরঙ্গপুর ৭ নং সেক্টর হেড কোয়ার্টারে। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র গোলাবারুদ ইত্যাদি নিয়ে ট্রাকযোগে ভাগ হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যুদ্ধ শুরু করি।

প্রথমে আমরা ফজলুল মতিন মুক্তা ও খ.ম.আখতার কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি গঠন করি। এ কোম্পানিতে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ২৭৩ জন। সবাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার লোক। কিছু ছিল জয়পুরহাট, বগুড়া ও

নওগাঁর । আমরা প্রথমে রাজশাহী জেলার ভোলাহাট এরিয়ায় আনারপুর ও মশরিপূজার নামক স্থানে দুই দলে ভাগ হয়ে দুটি পাকিস্তানি বিওপি দখল করি। এই বিওপি দখল করতে আমাদের তেমন কঠিন যুদ্ধ করতে হয়নি। আমরা প্রথম রাতের অন্ধকারে দুটি বিওপিতে চ্যালেঞ্জ ফায়ার দিই এবং ২ ইঞ্চ মর্টার ও রকেট লাঞ্চার ফায়ার দিতেই পাকিস্তানিরা ভয়ে বিওপি ছেড়ে চলে যায়। আমরা বিওপি সম্পূর্ণ দখলে এনে ডিফেন্স করে বসি। কিছুদিন থাকার পর আমরাসহ আরও ৪-৫টি মুক্তিযোদ্ধা কোম্পানি মিলে মেজর গিয়াস, জাহাঙ্গীর ও আজিজুল বারী কমান্ডারদের নেতৃত্বে শিবগঞ্জ থানা পাকহানাদারদের বড় ক্যাম্পের ওপর হামলা করি। এখানে ২ দিন ১ রাত পূর্ণ যুদ্ধ হয়। পরে পাকহানাদাররা হটে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, এই যুদ্ধে আমরা বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধাকে হারাই। অনেকে আহত হয়। তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে আমরা দেশের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকি। এ সময় অনেক সম্মুখযুদ্ধে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে। হারাতে হয়েছে অনেক সহযোদ্ধা বন্ধুকে। যাদের কথা আজও ভুলতে পারিনি।

যুদ্ধ করতে করতে যখন ক্লান্ত ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ল মা, ভাই-বোনদের এক নজর দেখব। যুদ্ধের ময়দানে ইচ্ছা করলেই তা পূরণ হয় না। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা শক্তির জোড়ে একদিন আমি অস্ত্র হাতে চলে এলাম নিজ এলাকায়। উত্তর টাঙ্গাইলের কাদেরীয়া বাহিনীর ১ নং হাকিম কোম্পানিতে আমি যোগ দিলাম। কোম্পানি টুআইসি ছিল বকুল সাহেব। তার বাড়ি ছিল মুক্তাগাছা। তার একটি ব্রিটিশ এলএমজি ছিল। সেই এলএমজি আমাকে চালাতে হতো। যদিও যুদ্ধের ময়দানে কেউ হেভি হাতিয়ার চালাতে চাইত না। কিন্তু বকুল সাহেব নাছোড়বান্দা। তার যাকে পছন্দ তাকে দিয়েই তার গান চালাতেন। যা হোক, বকুল সাহেবের এলএমজিটা আমি খুশি মনেই নিয়েছিলাম। আমার একটিই সান্ত্বনা, এই গান চালাতে গিয়ে আমি বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েও আল্লাহর অসীম দয়ায় প্রাণে বেঁচে গেছি। এমনও দুর্ধর্ষ লড়াই করতে হয়েছে, যেখান থেকে এলএমজি নিয়ে ফিরে আসা ছিল দুষ্কর। অথচ বকুল সাহেব, হাকিম সাহেব ভেবেছেন যে ফজলু আর নেই; কিন্তু দেখা গেছে পরক্ষণেই আমি ঠিকই ক্যাম্পে এসে হাজির হয়েছি।

স্বাধীনতার মাস দুই আগের ঘটনা। আমার বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে মাইল দেড়েক দূরে হরখালী গ্রাম । সেই গ্রামে মজিবর সরকারের বাড়িতে আমরা হাকিম কোম্পানি এসে ক্যাম্প করলাম। ওই সুযোগে রাতে বাড়ি এসে বাড়ির করুণ অবস্থা দেখে গেলাম। দেখে গেলাম মা ও ছোট ছোট ভাই-বোনদেরকে। যথাসময়ে রাতেই ক্যাম্পে ফিরে এলাম। কিন্তু সেদিনের দুঃখ আজও ভুলতে পারি না। কারণ আমার বাড়ির পশ্চিম পাশেই রেল স্টেশন। বয়ড়া রেলস্টেশনে এবং স্টেশনের উত্তর পাশে পুলে ও দক্ষিণ পাশের পুলে সশস্ত্র রাজাকাররা পাহারা দেয়। যদি তারা একটু টের পায় তবে আমার গোষ্ঠীশুদ্ধ সব শেষ করে দেবে। অতি গোপনে মায়ের কান্নাজড়িত কণ্ঠে শুধু বাবা ডাক শুনে বিদায় চাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সেদিন মায়ের হাতের রান্না করা এক মুঠো ভাতও আমার ভাগ্যে জোটেনি। তাই মাকে সান্ত্বনা দিতে হলো– মা, আমি যদি ভাত খেতে চাই, তবে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। কারণ তখন ঘরের সাথেই ছিল রাজাকারের দোসর ও পাকিস্তানী ভক্তরা। পাশেই ছিল পাকহানাদারের একনিষ্ঠ দোসর, দালাল কুখ্যাত মৌলভীগোষ্ঠী। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর থেকেই বারবার রাজাকারদের কাছে লিস্ট দিচ্ছিল যে, ফজলু মুক্তিতে গেছে, অমুক রাতে বাড়ি এসেছিল, এই সব বহু তথ্য। তাই মাকে সেদিন বুঝিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম ক্যাম্পে।

পরদিন সকালে আমার বড় বোনের বাড়ি নইল্যাগুনা নামক গ্রামে যাই বোনকে একনজর দেখতে। সময় সকাল ৯-১০টা হবে। বোন তো আদরের ভাইকে পেয়ে খুশিতে কি খাওয়াবে কোথায় বসাবে, কি করবে অস্থির। বোনও সেদিন শখ করে মোরগ জবাই করে রান্না করছিল। আমিও ভাবছিলাম আজ বোনের হাতের রান্না খেয়ে যুদ্ধে যাব। কিন্তু বিধি বাম। খাবার আগেই খবর এলো রাজাকার এসেছে। এখন কী করি ? আমি মরে যাই আপত্তি নেই। কিন্তু বোন দুলাভাই বা দুলাইভাইদের সবার কী হবে? ভেবে দুলাভাইকে শুধু বললাম, আপনারা বাড়ির আশপাশে ডোবায় গর্তে যেখানে পারেন লুকিয়ে পড়ুন। বলেই আমি এলএমজি নিয়ে সোজা রাজাকারদের দিকে ছুটলাম।

সঙ্গে আমার এক সহযোদ্ধা ছিল মোশাররফ, বাড়ি পঞ্জাশী। তখন আমার বয়স ও মোশারফের বয়স একই। দুজনই ১৫-১৬ বৎসরের জোয়ান। যাক, দৌড়ে গিয়ে রাজাকারদের ওপর ২ জনেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অতর্কিতে এলএমজির ব্রাশফায়ারে রাজাকারদের দিগ্বিদিক ছুটতে হলো। মোশাররফের কাছে ছিল এসএলআর। সে ফায়ার দিতে লাগল। আমি ব্রাশ মারতে মারতে ডিগ্রিবুন্দ গ্রামের মাথারবাড়ি কালুখার পুকুর পাড়ে উঠে পড়লাম। দেখি ধানের ক্ষেতের মধ্যে ২ রাজাকার নড়েচড়ে। ওদেরকে হ্যান্ডস-আপ করিয়ে দুইজন রাজাকারকেই জাপটে ধরে ফেললাম। এদিকে ক্যাম্পের এক প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা আমাদের গোলাগুলির আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আমাদেরকে উদ্ধার করে। পরে সেই রাজাকার ও আঃ হাই মাস্টারকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। আঃ হাই মাস্টার ছিল ওই রাজাকারদের ডেকে আনার অপরাধে অপরাধী। যদিও তিনি আমার শিক্ষাগুরু ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য সেদিন শিক্ষাগুরুও ক্ষমা পায়নি। শিক্ষাগুরু কেন, জন্মদাতা পিতা হলেও মাফ ছিল না, এই শর্তে আমরা হাতিয়ার হাতে নিই।

যুদ্ধের ময়দানে আমাদের পেটে ভাত ছিল না। ছিল না পরনে লুঙ্গী, গায়ে গেঞ্জি। এই স্বাধীনতার জন্য আমরা কতই না কষ্ট করেছি। কত রক্ত দিয়েছি। তারপর একদিন এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমরা কি স্বাধীন হতে পেরেছি? যদি তাই হবে তবে কেন এত লাশ, এত বোমাবাজি, এত সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ঘুষ দুর্নীতি, চাপাবাজি? তাই এই সময় ও আগামী প্রজন্মকে আহ্বান করছি তোমরাও আমাদের মতো একটি মুক্তিযুদ্ধ কর। যে যুদ্ধ হবে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ধর্ষণ, ঘুষ, রাহাজানির বিরুদ্ধে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ। আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি, আর তোমরা যুদ্ধ করে তার সুফল আনবে। এই প্রত্যাশা সকলের কাছে।

সূত্রঃ জ-৩৭৭

সংগ্রহকারী :	বর্ণনাকারী :
মো. ফয়সাল আরেফীন (তুষার)	**এ কে এম ফজলুল হক**
যমুনা সার কারখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম : রুদ্র বয়ড়া, ডাক : পোগলদিঘা
শ্রেণী-৭ম	থানা : সরিষাবাড়ী, জেলা : জামালপুর
	বয়স : ৪৯ বছর

এতে আমার কোনো দুঃখ নেই

ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে যুদ্ধে প্রায় সকল মানুষের অবদান অবিস্মরণীয়। এমন একজনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। আমি তার কাছে ছুটে গিয়ে জানতে চাইলাম যুদ্ধের কথা। সে হচ্ছে আমার দাদু।

দাদু বলল, তখন আমার বয়স ১৮ বছর। আমাদের পাশের গ্রামে হানাদার বাহিনী এসেছে। তারা প্রতিদিন গুলি করে আমাদের দিকে। গুলিগুলো এসে আমাদের ঘরের পিড়াতে ঢুকে যায়। তাদের বন্দুকের গুলিতে একটি বটগাছে গর্ত হয়। কামানের গোলাতে বটগাছের এক জায়গায় ছিদ্র হয়ে যায়। রাজাকারদের পরামর্শে পাশের গ্রামের অনেক বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুক্তিবাহিনীর একজন এসে ৩০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে মধুপুরের দুখোলার দিকে একটি ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চায়। সেখানে তাদের ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধে পাঠানো হবে। সে মোতাবেক আমি আমার গ্রামে ও আশপাশের গ্রামে খবর দিই। খবর শুনে অনেকেই ছুটে আসে সেই রাতে। আমরা সবাই বসে একটি কমিটি গঠন করি। সদস্য সংখ্যা হয় ৯০ জন। পরদিন আমরা চাল, মুড়ি, ডাল, ছাগল ইত্যাদির ব্যবস্থা করি এবং রাতে রওনা হই দুখোলার উদ্দেশ্যে।

ধনবাড়ী যাওয়ার পর আমরা দেখলাম মেইন রাস্তা দিয়ে হানাদার বাহিনী টহল দিচ্ছে। আমি কমিটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে দিই। এক ভাগ রাস্তার ওই পাশে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই যাওয়ার মধ্যে একটি গোলযোগ বেঁধে যায়। একজন সবশেষে রাস্তা পার হওয়ায় সময় হানাদার বাহিনীর গাড়ির সামনে পড়ে যায় এবং তাকে ধরে ফেলে। তখন রাত প্রায় ১২টা বাজে। সবাই ভীত হয়ে যায়। তখন সে চালাকি করে বলে যে, আমি সামনের দোকানে যাচ্ছি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ। তারা খুশি হয় এবং বোকাও হয়। পরে সে আমাদের সাথে যোগদান করে। তারপর মাঝপথে গিয়ে আমরা মুড়ি ও গুড় খাই এবং ঘন্টা খানেকের মধ্যে সেখানে গিয়ে পৌঁছি। ক্যাপ্টেন আমাকে ধমক দেয়। তিনি বললেন, আমি নিয়ে আসতে বলেছি ৩০ জন আর আপনি নিয়ে এসেছেন ৯০ জন ? আমার কাছে বন্দুক আছে ৩০টি। তারপর তিনি আমাদের চলে যেতে বলেন। সাথে নিয়ে যাওয়া সেই চাল, ডাল ও ৫টি ছাগল তাদের খাওয়ার জন্য দিয়ে আমরা রাতে চলে আসি।

বাড়ি এসে শুনি, এক রাজাকার হানাদার বাহিনীর কাছে গিয়ে বলেছে একজনের কথা যে আমাদের সাথে গিয়েছিল। হানাদার বাহিনী তাকে ধরতে আসে। কিন্তু সে অনেক আগেই সেখান থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায়। তারপর আমরা তা জানতে পেরে পরদিন রাতে কয়েকজন মিলে মাথায় গামছা মুড়ে সেই রাজাকারকে ধরে আনি। তাকে মসজিদের সামনের লিচু গাছটাতে বেঁধে অনেক মারধর করি এবং গ্রাম থেকে বের করে দিই। এই ধরনের আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা বলে শেষ করা যাবে না।

আরেকটি ঘটনা আছে যা আমার জীবনকে নিয়েই ঘটেছে। একদিন রাতে আমার বাড়িতে কিছু মুক্তিযোদ্ধা আসে এবং একজন আমাকে বলে, তুমি এক কাজ করো, ওই বটগাছের কাছে গিয়ে দেখ হানাদার বাহিনী কোথায় অবস্থান করছে। তবে সতর্ক থেকো, কোনোমতে যাতে তারা বুঝতে না পারে। হামাগুড়ি দিয়ে যাবে। তখন আমি একটি গামছা মাথায় বেঁধে লুঙ্গি কাছা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে লাগলাম। মুক্তিবাহিনীর কাছে ছিল সীমিত গুলি। তাই এই ব্যবস্থা। পরে আমি সেই বটগাছের ফাঁক দিয়ে দেখলাম। তেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু দেখা যাচ্ছিল কয়েকজন হানাদারের মাথার টুপি মাটির সাথে। পরে আমি হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসার সময় ঘটে গেল সেই ভয়াবহ বিপদ। আমি বুঝতে পারিনি যে হানাদার বাহিনী ওঁত পেতে আছে। আমাকে দেখে হানাদার বাহিনী গুলি শুরু করল। একটি গুলি এসে ঠিক হাঁটুর নিচে লাগল, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কে বা কারা আমাকে নিয়ে আসে আমি বুঝতে পারিনি।

তারপর আমাকে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা? অবশ্য আমি যদি সেখানে বলতাম যে আমি মুক্তিযোদ্ধা তাহলে সে বিনা টাকায় চিকিৎসা করত। কিন্তু আমি বলি, না আমি মুক্তিযোদ্ধা না। অবশেষে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলল যে পা কেটে ফেলতে হবে। সে মোতাবেক আমার পা কেটে ফেলল। এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ আমি দেশের জন্য একটু হলেও কাজ করেছি। আমি সেই হাসপাতালে থাকাকালীন মুক্তিবাহিনীর একটি গোলা হাসপাতালের পাশে একটি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পের ওপর পড়ে এবং অনেক হানাদার নিহত হয়। আমি তার ফলে আনন্দে আত্মহারা হই এবং ভাবি যে আমার গ্রামে আসা সেই মুক্তিযোদ্ধারা বুঝি পাশের গ্রামে সেই হানাদারদের মেরে ফেলল।

কিছুদিন পর আমি বাড়িতে ফিরে আসি। এসে শুনতে পাই যে পাশের গ্রামের সেই হানাদাররা গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে এবং সেই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অনেক হানাদার মারা গেছে। এটা শুনে আমি আরো আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। এখন আমি নিজেই কাঠের পা বানিয়ে হাঁটতে পারি। এমনকি সাইকেলও চালাতে পারি।

সূত্র: জ-৪০৪

সংগ্রহকারী ::	বর্ণনাকারী ::
ফাহিম উদ্দিন খান	**মো. ফজলুল হক খান**

যমুনা কারকারখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শ্রেণি : ১০ম, রোল : ৯, শাখা : ব্যবসায় শাখা	গ্রাম : দোলভিটি, ডাক: চাপারকোণা থানা : সরিষাবাড়ী, জেলা : জামালপুর সম্পর্ক : বাবা